বিস্ফোরণ

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

বেঙ্গল পাবলিশার্স : কলিকাতা—১২

প্রথম সংস্করণ—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬২

প্রকাশক—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
বেঙ্গল পাবলিশার্স
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট,
কলিকাতা—১২

মুদ্রাকর—অজিতমোহন গুপ্ত
ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও
৭২।১, কলেজ স্ট্রীট
কলিকাতা—১২

প্রচ্ছদপট-শিল্পী
আশু বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্লক ও প্রচ্ছদপট-মুদ্রণ
ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও

বাঁধাই—বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

ছয় টাকা

একটি মুহূর্ত

বিমলকে কালী-মন্দির থেকে বেরিয়ে আসতে দেখে বিস্ময়ে প্রায় স্তম্ভিত হয়ে গেল অমরেন্দ্র। নাস্তিক বিমল, কালাপাহাড় বিমল কালী-মন্দিরে? কি ব্যাপার?

মদের দোকান বা বেশ্যালয় থেকে সাধুখ্যাতিসম্পন্ন কাউকে বের হতে দেখলে যেমন পরিচিত জনে খপ ক'রে হাত চেপে ধ'রে বলে—কি মশাই? কি কাণ্ড? গিছলেন কোথায়? এবং সঙ্গে সঙ্গে বেশ বার কয়েক ভুরু নাচিয়ে ব্যঙ্গ ও কৌতুকের বাণ একই সঙ্গে সব্যসাচীর মত প্রয়োগ করে, ঠিক তেমনি ভাবে ও ভঙ্গিতেই অমর কালী-বাড়ির পাশের রাস্তাটির মোড়েই তার হাত চেপে ধরলে—কি রে? কি কাণ্ড? গিছলি কোথায়?

ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বিমল বললে—অমর!

—মনে হচ্ছে, চিনতে কষ্ট হচ্ছে। হাসলে অমর। সত্যই বিমলের দৃষ্টি একটু অস্বাভাবিক। অথবা মানুষের আত্মমগ্ন অবস্থায় দৃষ্টি অন্তরের সঙ্গে বিচ্ছিন্নসূত্র হয়ে আকাশে ওড়ানো বেলুনের মত অর্থহীন ভাবে ভেসে বেড়াচ্ছে।

—নাঃ, চিনেছি। অবশ্য একটু দেরি হয়েছিল।

—কিন্তু এখান থেকে বেরুলে তুমি? কালী-মন্দির থেকে?

—হ্যাঁ।

—সেই তো জিজ্ঞাসা করছি। পরক্ষণেই হেসে সে বললে—বুঝেছি। কারুর পিছন পিছন বুঝি? অর্থাৎ কোন পথচারিণী সুন্দরীর। দেবস্থলে সন্ধ্যার পর চিরকাল যে খেলা চ'লে আসছে, সেই খেলা। ভক্তির স্রোতো-ধারার এক পাশ ঘেঁষে একটি স্রোত ব'য়ে যায় অমৃতের সঙ্গে বিষের মত—অথবা বলতে পার দেবতার চরণোদকের পুষ্পগন্ধ এবং চিনির স্বাদের অন্তরালে নানা রোগের বীজাণুর মত। বিমলই বলত—দেবতার চরণোদকে কারও

কোন কল্যাণ হয়েছে কিনা জানি নে; কিন্তু অকল্যাণ যে লক্ষ লক্ষ মানুষের হয়ে আসছে, আবহমানকাল যে লোকে খেয়ে রোগাক্রান্ত হচ্ছে—কেউ টাইফয়েডে, কেউ ব্যাসিলারি ডিসেন্ট্রিতে, এতে আমার সন্দেহ নেই। দেহ-পসারিনীরা দেবদর্শনার্থিনীদের সঙ্গে মিশে আসছে যাচ্ছে, চকিতে ফিরে তাকাচ্ছে এবং যাকে টানবার তাকে টান দিয়ে চ'লে যাচ্ছে। সেও তার অনুসরণ করছে।

বিমল কথাটা বুঝল না এমন নয়, কিন্তু বুঝেও রাগ-রোষ করল না। বিমলের কাছে দুটোই অপবাদমূলক। বিমল দেবতার এলাকাও মাড়ায় না এবং এদের এলাকায়ও হাঁটে না। সে বলে—স্বর্গেও যেতে চাই নে, নরকেও না। নিতান্তই মর্ত্যের মানুষ—মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে।

অমর দেবতার এলাকা মাড়ায় না, কিন্তু এ এলাকায় যেতে তার আপত্তি নেই। এম. এ. ক্লাসে পড়তে পড়তেই অমর সাহিত্যিক হিসেবে খ্যাতিলাভ করেছে এবং সাহিত্যের উপাদান সংগ্রহের অজুহাতে স্থান-অস্থান পরিভ্রমণে নেশা জমিয়েছে। কারুর সঙ্গে দেখা হলে পাশ কাটিয়ে গিয়ে গঞ্জিকা-মিশ্রিত মিকশ্চারে তৈরী সিগারেটে টান মেরে ভিতরের হিমেল ভাবটা কাটিয়ে নেয়। এখন তো পেকে গেছে, লেখক হিসেবেও বটে—ওদিকেও বটে। বিমলের সঙ্গে অমরের এখানেও পার্থক্য আছে; বিমল নেশা করে না এমন নয়। মধ্যে মধ্যে সে মদ খায়। হোটেলে ব'সে খায়। তাও পরিমিত। এবং মদ ছাড়া অন্য নেশা সে করে না। নেশায় সে পেকেও ওঠে নি। মাত্রা বেশী হ'লেই অসুস্থ হয়।

কথার উত্তর না পেয়ে অমর বললে—কি হে? কথা বল না যে?

—কি বলব?

—বলবে সত্যি কথাটা। বন্ধুর কাছে গোপন যদি কর—তবে তোমার মত বড় পাপী সংসারে নেই। অবশ্য তার মানে বলছি না যে, নরকে যাবে তুমি—সে তুমিও মান না, আমিও মানি না। আই মীন্ ক্রিমিনাল—তা হ'লে তুমি।—কে? কেমন? পেলে না? হারিয়ে গেল? না, ভুল মানুষের পিছু ধরেছিলে?

—সে তো অনেক কথা ভাই।

—চল, কোথাও গিয়ে বসি।

—কোথায়?

—চল না কোন চায়ের দোকানে কিংবা কোন হোটেলে বারে।

—না। চল কেওড়াতলা—দেশবন্ধুর স্মৃতিমন্দিরের ওখানে বসব।

*   *   *

বিমল বিচিত্র মানুষ।

ডানপন্থীও নয, বামপন্থীও নয়—বলতে গেলে সোজাপন্থী, যে সোজাপথে ওর চোখ চলে—সেই পথে হাঁটে বিমল। বিমল ছবি আঁকে। দুর্ভিক্ষের ছবিও আঁকে, আবার স্বাধীনতা-দিবসের কলকাতার উৎসব-সজ্জার ছবিও আঁকে। মজুরের কৃষকের ছবিও আঁকে, আবার জ্যোৎস্না-রাত্রির পটভূমিতে ফুলেভরা গাছের তলায় প্রেমবিহ্বলদৃষ্টি তরুণ-তরুণীর ছবিও আঁকে। নববধূর ছবি আঁকে—সে বধূর অঙ্গে মনোহর সজ্জা—সলাজ প্রসন্ন দৃষ্টি দিতে সে কার্পণ্য করে না। তার মজুর-কৃষকেরা কঙ্কালসার হয় না, চোখে মুখে তাদের তিক্ত অবসাদ, ক্রুদ্ধ অনিচ্ছা থাকে না; তাদের সে পেশীসবল মানুষ ক'রে আঁকে—পেশীসবল দেহ, চোখে মুখে দুর্জয়কে জয় করার দৃঢ়তা ও আনন্দ থাকে। যে মেযেরা ধান পোতে, তাদের খোঁপায় লাল ফুলের আভাস দেয়, পরনের কাপড়ে কাদার দাগ দিতেও ভোলে না, রঙিন আঁচলা দিতেও ভোলে না। ওর একখানা ছবি আছে স্বাধীনতা-দিবসের—তরুণী মা, পরনে অমলধবল খদ্দরের শাড়ি—শাড়ির পাড়টিতে জাতীয় পতাকার রঙ, চোখে মুখে শারদীয়া পূজা-উৎসবের আনন্দ—সে তার ছোট ছেলেটিকে খদ্দরের সাজে সাজিয়ে মাথায় পাগড়ী বেঁধে তার উপর ছোট একটি জাতীয় পতাকা এঁটে দিচ্ছে। জানলার মধ্যে দিয়ে দেখা যাচ্ছে রৌদ্রকরোজ্জ্বল দিনের দীপ্তি পড়েছে ধবধবে সাদা একটি বাড়ির উপর—তার কার্নিশের গায়ে সারি সারি জাতীয় পতাকা সাজানো এবং একেবারে মাথায় উড়ছে—মস্ত একটি জাতীয় পতাকা। আবার দুর্ভিক্ষের ছবিও সে যে কখানা এঁকেছে তার মত জোরালো ছবিও কেউ আঁকে নি। একটা ছবি আছে তার—কঙ্কালসার মা আর ছেলে; মা ছেলের গলা চেপে

ধরেছে এক হাতে, অন্য হাতে এক টুকবো পচা খাবার খাচ্ছে—ছেলেটাও টানছে সেই খাবাব। আর একখানা ছবিতে মা অজ্ঞান হয়ে প'ড়ে আছে—শিশুসন্তান তাব শুষ্ক স্তনবৃন্ত চুষছে, বেরিয়ে আসছে রক্ত।

বামমার্গীবা বলে—স্বাধীনতা-দিবসের ও-ছবি কেন আঁকবে? ওর পরিকল্পনা হবে কঙ্কালসাব কতকগুলি লোক একটা মঞ্চ প্রাণপণ শক্তিতে ধ'রে দাঁড়িয়ে আছে, তার উপব স্থূলকায় একটা লোক হাতে ক'রে তুলে ধরেছে তেবঙ্গা ঝাণ্ডা, চোখ দুটো তাব লুব্ধ; মুখের হাসি তাব পৈশাচিক—এই রকম একটা কিছু। কৃষাণ-মজুরদেব দেহ কঙ্কালসাব নয় কেন? কৃষাণীদের মাথায় লাল ফুল গোঁজা থাকবে কেন? আজকের দিনে ও-ছবি কেন?)

ডানপন্থীরা বলে—দুর্ভিক্ষেব ছবি কেন? কৃষাণরা যেখানে চাষ করছে সেখানে ক্যানেল কই? আজকের দিনের কি ওই ছবি?

বিমল বলে—ছবি তো কোন একটা বিশেষ দিনের নয়। সে তো সকল দিনের।

ঠিক এই কারণেই বিমল নিঃসঙ্গ এবং প্রশংসাও বিশেষ পায় নি।

সে থাকে একা একাই। ছোট একখানি ঘর। মেসে বা হোটেলে পোষায় না। অবিবাহিত মানুষ, ছবি আঁকে—সেগুলি থাকে এক দিকে, অন্য দিকে থাকে সে নিজে। একজন চাকর আছে, সেই একাধারে সব করে। রাঁধে বাড়ে, ঘর ঝাঁট দেয়, বাসন মাজে, রঙয়েব বাটীগুলি তুলিগুলি ধুয়ে দেয—সরঞ্জাম সাজিয়ে রাখে, বিমল সব ঠিক ক'রে নেয়।

অমরেন্দ্র বামপন্থী। অবশ্য লেখার বেলায়। বামপন্থার সঙ্গে জীবনের মিল নেই এবং কোন দলের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্বন্ধও নেই। অবস্থা তার বিমলের থেকে অনেক ভাল। অমরেন্দ্র বই লিখে পাবলিশারদের কাছ থেকে যেখানে চার শো টাকা পায়, বিমল সেই বইয়ের প্রচ্ছদপট এঁকে দেয়—পায় তিরিশ থেকে চল্লিশ। অমরের ক'খানা বইয়ের প্রচ্ছদপট এঁকেছে সে। অমর সভায় যায়, সমিতিতে যায়, বক্তৃতা করে, বিবৃতিতে সই দেয়; অন্যায়ের প্রতিবাদ জানায়; আবার যথা ইচ্ছা ঘুরেও বেড়ায়। তার সম্পর্কে লোকে বলে—কয়েকটি মেয়ের সঙ্গেই তার অন্তরঙ্গতা আছে; চিঠিও অনেক পায়; সে কথা

সে নিজেই গল্প করে। এ ছাড়াও হোটেলে বারেও তাকে সঙ্গিনী সমভিব্যহারে দেখা যায়, সঙ্গিনীদের মুখও চেনা-চেনা, ছবির পর্দায় দেখা-দেখা মনে হয়। এ সবই তার প্রকাশ্য জীবনের সামিল। ইচ্ছে ক'রে গোপনও করে না, আবার এ নিয়ে হৈ-হৈও করে না। করে কখনও সখনও বিমলের কাছে।

দেশবন্ধু-স্মৃতি-সৌধের চারিপাশের দাওযা লোকজনে ভর্তি। ওরই মধ্যে গঙ্গার দিকের দাওয়ায় এক জায়গায় ঠাঁই ক'রে নিয়ে বসল দুজনে।

সমর বললে—সেই হাসির গল্পে আছে, কোন পাড়াগেঁয়ে বর বাসরে শ্মশান-সঙ্গীত গেয়েছিল—'মনে কর মন শ্মশান-আয়োজন কাঠের শয্যায় পাতা বাসর মনোহর।' তোরও যে তাই হ'ল বিমল। শ্মশানে তুই প্রেমের, প্রেমের না হোক—মনোহারিণীর গল্প বলতে এলি! হঠাৎ থেমে গেল—তারপর হেসে বললে—মাফ চাচ্ছি ভাই, যাক।

—কি হ'ল? হঠাৎ মাফ কেন?

হেসে আঙুল দেখিয়ে অমর বললে—ওই দেখ্।

একটি শিকার-সন্ধানী নারী একটি শিকার-সন্ধানী পুরুষের সন্ধান পেয়েছে। দুজনেই দুজনের দিকে মধ্যে মধ্যে তাকাচ্ছে, চোখে চোখে কথা হচ্ছে ইঙ্গিতে—কিন্তু এখনও মুখের কথা হয় নি। মেয়েটির চারিদিকে আরও কয়েকজন ঘুরে বেড়াচ্ছে। এরা দাঁড়াচ্ছে না। দাঁড়াবার মত সাহস নেই।

অমর বললে—বাসবে শ্মশানের গান চলে না, কিন্তু শ্মশানে প্রেমের গান থেকে ব্যভিচার পর্যন্ত চ'লে থাকে। ওর সীমানা মরণের ঘরের দোর পর্যন্ত। শ্মশান তার ওপাশে নয়। বল্, কি ব্যাপার?

বিমল বললে—সে দিনের তর্কের আসরে তুই তো ছিলি! সেই যে শিবেনদার সঙ্গে সেদিন তুমুল তর্ক তাঁর বইয়ের প্রচ্ছদপট নিয়ে! বুদ্ধদেবের ছবিতে বুদ্ধের মুখের চারিদিকে জ্যোতির্মণ্ডল নিয়ে!

—খুব মনে আছে। তুই জ্যোতির্মণ্ডল দিস নি ব'লে তোর ছবিখানা নাকচ ক'রে দিলে। একেবারে রি-অ্যাক্‌শনারি হয়ে গেছে। যত লেখার ক্ষমতা ক'মে যাচ্ছে, তত আধ্যাত্মিকতার ভিজে কাঠে আগুন ধরিয়ে সব ধোঁয়াটে ক'রে দিতে চাচ্ছে, ধোঁয়ার কষ্টে লোকের চোখে জল আসছে—বাস্,

আর চাই কি! কই, তোমরা আন পাঠকের চোখে জল! আরে বাবা, আমরা তো চোখে জল আনতে চাই নে। আগুন চাই।

—আমি অবশ্য তাও চাই নে। জলও না, আগুনও না। চোখের দৃষ্টিতে বুদ্ধির দীপ্তি, বিচারের ভাবনা, প্রশ্ন এবং মীমাংসা। বাস্‌। সেই বিচার ক'রেই বুদ্ধের মুখে আমি প্রসন্ন হাসি দিয়েছিলাম, দৃষ্টিতে করুণা দিয়েছিলাম। কিন্তু জ্যোতির্মণ্ডল! ওটা আমার বিচার-বুদ্ধিতে বেধেছিল। উনি বললেন, জীবনকালে বুদ্ধের মুখের চারিপাশে জ্যোতি বের হ'ত না-হ'ত সে কথার উপর আমি আদৌ জোর দিচ্ছি না, কিন্তু শিল্পে তাকে দিতেই হবে। মনের মধ্যে বুদ্ধের মহিমা উপলব্ধি করলেই যে মনের মধ্যে জ্যোতির স্পর্শ পাই।

—বাজে! বাজে!

—ওঁর কথা মনে আছে। বলেছিলেন, আমি মনে মনে অনুভব করেছি, তাই বলেছি।

অমরেন্দ্র বললে—আমি ভাই হাসি চেপে রাখতে পারি নি। মুখ ফিরিয়ে হেসে বেঁচেছিলাম।

—হ্যাঁ। কিন্তু সেটা ওঁর চোখ এড়ায় নি। উনি দেখেছিলেন।

—তা জানি না।

—আমি জানি। আমাকে বলেছিলেন শিবেনদা। উনি তো তখনই উঠে গেলেন। আমাকে ডেকে নিলেন। রাস্তায় বললেন, বিমল, ছবিটা আমার বইয়ের জন্যে। আমার বইয়ে আমি আমার অনুভব করা বুদ্ধের সত্য কথা লিখেছি। অনেকে হাসলেও সে আমি দেখেছি। কিন্তু তাতে আমি লজ্জিত নই। আমি অনুভব করি, বুদ্ধের যে মহিমা তা এই মানুষের মুখে—সে যত সুন্দর ক'রেই এঁকে থাক্‌, তাতে প্রকাশ পায় নি। তুমি এর চারিদিকে জ্যোতির্মণ্ডল যোগ ক'রে দাও বা তুমি যদি অন্য উপায়ে পার তাকে ফুটিয়ে তোল।

উনি চ'লে গেলেন। আমিও অন্যমনস্কভাবে ভাবতে ভাবতে পথ হাঁটছিলাম। হাজার প্রশ্নে বার বার আমার কপাল কুঁচকে উঠেছিল। নিজেই আমি বুঝতে পারছিলাম।

* * *

বাস্তব পৃথিবীর মাটির উপর সবুজ ঘাস জন্মায, লালচে ঘাসও আছে, ধান পাকে, পেকে সোনার রঙ ধরে। কিন্তু মাটির আসল রঙ মেটে। আকাশের নীল রঙও ছোঁয়া যায় না, ধরা যায় না, সব ভূযো। স্থষ্টির মধ্যে প্রতাবণা আছে। সেই প্রতারণার যাদুকর কি যাদুকরীর যাদুজাল ছিন্নভিন্ন ক'রে যে কালে তার আসল রঙটির সন্ধান চলছে, মানুষের মনের ভিতরটায় সন্ধানী আলো ফেলে যে কালে মাযেব বুকে নিদ্রিত শিশুর তৃপ্তির মধ্যে সেই আদিম পশুটাব সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে—সেই কালে পুবানো প্রতারণা—মহিমা? জ্যোতি? আবার চোখের জলের বর্ষা স্থষ্টি ক'রে তার উপর আলো ফেলে সাতরঙা রামধনু ফুটিয়ে রাবণের দশমুণ্ড ও সীতাব অগ্নি-পবীক্ষার কথা বিশ্বাস করানো? আধ পাগলা জডবুদ্ধি একটা মানুষকে একটা বটতলার নীচে বেদীর উপর বসিয়ে মহাপুরুষ ব'লে চালানো?

মনে মনে প্রতিবাদ তীব্র থেকে তীব্রতর হযে উঠছিল বিমলের।

কলেজ স্ট্রীট থেকে হাঁটতে হাঁটতে এসে পডল বউবাজার পার হয়ে ওযেলিংটন স্ট্রীটে।

—কি খবব? কোথায়? শিল্পী? রাস্তার উপর ফুটপাথ ঘেঁষে মোটব একখানা দাঁড়িযে গেল।

—কে?

—কি ভাবছ? চিনতে পারছ না?

কলকাতার মস্ত এক ধনীর তরুণ উত্তরাধিকারী, শিল্পরসিক, নাট্যরসিক, নৃত্যরসিক; কোন্ রসেই বা বসিক নয? সকল রসের পাঞ্চ তৈরী ক'রে রূপো দিয়ে পাড় বাঁধানো সুইমিং পুল তৈরী ক'রে সাঁতার কাটছে দিবারাত্রি। বিচিত্র বেশবাস। সিল্কের পায়জামা, রঙিন সিল্কের কলারওয়ালা কফহাতা পাঞ্জাবি; বড়ুযা কাট্—তবে তার সঙ্গে কিছু নিজের মনোমত অদলবদল আছে; বিমল ফ্যাশনটার নাম দিযেছে 'সারখেড়ুযা কাট্' অর্থাৎ—সারখেল-কম-বড়ুয়া সারখেড়ুযা। ওদেব উপাধি সারখেল। সারখেল সোজা লোক নয়। পৃথিবীর মানচিত্রে ছোট একটা মটব কলাইযের মাপের স্বাধীন দেশের কনসাল হযেছে। সারখেলেব ভুরুতে ঠোঁটে একটি বিচিত্র ব্যঙ্গ-কৌতুকের

টান ফুটে উঠল, বললে—অদ্ভুত হয়েছে কিন্তু রাজঘাটের ছবিটা। বিউটিফুল! যা মেরেছ তুমি! ওয়াণ্ডারফুল! সমাধির চারি পাশে থরে থরে ফুটেছে পতঙ্গভুক ফুল। প্রজাপতিটাকে ফেলে দিয়ে মোক্ষম মার দিয়েছ। কিন্তু যাবে কোথায়? বাসা তো কালীঘাটে। বাসে ট্রামে না-গিয়ে মধ্য কলকাতায় হাঁটছ কোথায়?

একটু হেসে বিমল বললে—এমনি হাঁটছি একটু।

—এমনি? এ তো ভাল নয়। এর পর থেকেই তো জায়গা ভাল নয়। মানে নষ্টচাঁদের এলাকা। ওই হিন্দ সিনেমার এলাকা থেকে একেবারে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল পর্যন্ত নষ্টচাঁদের উদয় হয় সন্ধ্যের পর থেকে। বাংলার চিফ মিনিস্টারের বাড়ির সামনে, পুলিস-পাহারার নাকের সামনে দিয়ে হেঁটে চলে নষ্টচাঁদেরা, ওদিকে গভর্নরের বাড়ির চারিপাশের ফুটপাথ পর্যন্ত। ম্যাসাজ ক্লিনিকের বিজ্ঞাপনের গাযে আলো জ্বলছে। কিন্তু তুমি তো এ পথে হাঁটতে না। হঠাৎ কি হ'ল? মনোহর নষ্টচাঁদ দেখবে তো আমার সঙ্গে এস। আমি যাচ্ছি ড্যান্সে।

—ধন্যবাদ, তুমি যাও।

—যাবে না?

—না।

—কেন বল তো? আমার উপর তোমার যেন একটা অসূয়া আছে।

—না না। সে কি কথা?

—একদিনও তো আমার বাড়ি এলে না তুমি! এস একদিন।

—আসব।

—বেস্ট ককটেল খাওয়াব। এবং আরও কিছু—যদি চাও।

চ'লে গেল সারখেল। বিমল স্বস্তির নিশ্বাস ফেললে। সর্বাঙ্গ জ্বালা করে ওর ওকে দেখলে। একটা কথা কিন্তু ওর ভাল লেগেছে। রাজঘাটের ছবির ব্যাখ্যাটা। বুঝেছে ও ছবিটা। গান্ধীজীর সমাধির চারিপাশে পতঙ্গভুক গাছ জন্মেছে—থরে থরে ফুল ফুটেছে—রঙিন ফুল—ভিতরে তার আঠালো বিষ। বর্ণে আকৃষ্ট হয়ে প্রজাপতি এসে বসেছে একটা, সঙ্গে

সঙ্গে ফুল তার দলগুলি গুটিয়ে তাকে গ্রাস করছে। এই পৃথিবী। এই বাস্তব। এই সত্য।

নষ্টচাঁদ কথাটাও ভাল বলেছে সারখেল। সারখেলের ভাষাতেই প্রশংসা করতে ইচ্ছা হ'ল বিমলের। আপন মনেই সে বললে, ওয়াণ্ডারফুল! গুড!

চোখে আলো লাগল। সামনে হিন্দ সিনেমা। বারান্দার উপরে কার্ড-বোর্ডের কাটা যুবক-যুবতীর ছবি। চারিপাশে রঙিন আলো। কে জানে, কে? সুরাইয়া, না মধুমালা, না গীতাবলী, না নলিনী জয়ন্ত—ও ওদের ছবি চেনে না। ছবি অর্থাৎ সিনেমা বিমল দেখে না।

নষ্টচাঁদ!

হাসল বিমল। হন হন ক'রে চলেছে।

কি মনে হ'ল বিমলের। মনে হ'ল, বুকের ভিতরটা হঠাৎ চলকে উঠল, দেহের রক্তস্রোতে যেন জোর ধ'রে গেল। ক্ষুধা জাগল তার।

সেও গতি দ্রুততর করলে।

কিন্তু আরও কজন চলেছে—পিছু নিয়েছে।

বিমল একবার দাঁড়াল। আবার চলতে সুরু করল। এবার মেয়েটি দাঁড়িয়েছে। বিমল কাছে এল, দাঁড়াল, কিন্তু কিছু বলতে পারে না। তার গলার ভিতরটা যেন শুকিয়ে গেল। ধক্ ধক্ করছে বুকের ভিতরটা। ওদিক থেকে আরও দুজন লোক এই দিকে আসছে। বিমল আবার চলতে শুরু করলে।

* * *

গীর্জের ঘড়িতে ঢং ঢং ক'রে নটা বাজল।

ঘড়ির দিকে একবার তাকালে বিমল। দেহের মধ্যে আজ যেন বহ্ন্যুৎসব সুরু হয়েছে, অপরিমিত দেহকামনার জ্বালা জ্ব'লে উঠেছে তার সর্বাঙ্গে। মনের গ্লানি, ক্ষোভ—তারও সীমা নেই। নিজের উপরই তার ক্ষোভ হচ্ছে। এ কি? এ কি তার সংকোচ? কেন অকারণ এই লজ্জা? কিসের লজ্জা? বোধ করি সাতটা থেকে নটা—দু ঘণ্টা সে উন্মাদের মত পথে পথে ঘুরেছে।

মেয়েগুলি তিক্ত হয়ে উঠেছে তার আচরণে। বক্র তিক্ত হাসি হেসে মুখ ফিরিয়ে চ'লে গেছে। কতজন তার পাশ কাটিয়ে গিয়ে তাদের ডেকেছে, নমস্কার করেছে, কথা বলেছে, তারপর অতি আপন জনের মতই পাশাপাশি চ'লে গেছে—কেউ ট্যাক্সিতে চড়েছে, কেউ রিক্সায়, কেউ রেস্তোরাঁ-হোটেলে ঢুকেছে, কেউ চ'লে গেছে কোন দিকে। আর সে শুধু ঘুরেছে—ঘুরেছে—ঘুরেছে। লোকে তার দিকে তাকিয়ে দেখেছে, হেসেছে। সময় সময় সে ছুটে পালিয়েছে প্রায়।

বিমল ব'লে যাচ্ছিল। কেওড়াতলা শ্মশানে, তিন-চারটে চিতা জ্বলছিল, তার আভা এসে পড়েছে মন্দিরটার গায়ে, অমরের মুখে। লালচে আভায় অমরের কালো থ্যাবড়া মুখখানা অদ্ভুত দেখাচ্ছে। তার চোখে কৌতুক নাচছে। পুরু ঠোঁটে হাসি। মধ্যে মধ্যে হাঁটু দোলাচ্ছে। উল্লসিত হয়ে উঠেছে সে। বিমল থামতেই সে বললে—দিস ইজ লাইফ। এই হ'ল জীবনের স্বরূপ। আগ্নেয়গিরির ফুটন্ত লাভার মত সমাজের অনুশাসন পুঁথির শিক্ষায় গড়া মাথার চুড়াটাকে বিদীর্ণ ক'রে দিয়ে বেরিয়ে পড়ে।—আ! কথা শেষ ক'রে উল্লাসের প্রাবল্যে একটা 'আ' শব্দ উচ্চারণ ক'রে সে সিগারেটের বাক্স বের ক'রে তা থেকে বেছে নিয়ে একটা সিগারেট ধরালে। ওটাতে মাদক আছে। এমন একটি গল্পকে বাঘের শিকারের মাংস খাওয়ার মত পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করবার জন্যই সে ওটা খাবে। চক্ষুলজ্জা যেটুকু আছে কেটে যাক। সে বুঝতে পারছে। যা ঘটেছিল তা সে বুঝেছে। শেষ পর্যন্ত কোন পটিয়সী নষ্টচাঁদ ওকে টেনে এনেছিল ওই মন্দির-এলাকায়। এবং—। হেসে ফেললে অমরেন্দ্র। কালীঘাট, কালীঘাট কেন—পৃথিবীর সমস্ত দেবমন্দিরগুলি ওই রাগরঙ্গের লীলাভূমি। যত পাপ—যত ভণ্ডামি—যত ক্লেদ পৃথিবীতে আছে, সমস্ত কিছুর সঙ্গমস্থল এইখানে। বাইরে ওই দেব-মূর্তিকে রেখেছে যাদুকরীর ভূমিকায়। সিগারেটে একটা টান দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে সে বললে—তারপর?

বিমল বললে—নিজের উপর ক্রোধের সীমা ছিল না। আমার ভিতরের জ্বালা এবং ক্ষুধা পাক খেয়ে উঠছিল, সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে করছিলাম তিরস্কার।

হঠাৎ চোখে পড়ল রাস্তার উপরেই একটা বার। খোলা দরজা। ভিতরে সারি সারি টেবিল, লোকের ভিড় জ'মে আছে। মনে হ'ল, এই তো! এই তো সংকোচ দুর্বলতা সব ভাসিয়ে দেবার উপায়।

ঢুকে পড়লাম। টেনে নিলাম একখানা চেয়ার। বললাম—দু পেগ হুইস্কি।

এর পরেও বিমল একটা পাঁইট বিয়ার নিয়েছিল। নেশা আসতে বা জমতে খানিকটা সময় লাগে। সে সময়ের তরও সইছিল না। কই, মাথার মধ্যে সেই বিচিত্র উল্লাস জাগছে কই? বুকের ভিতরটার প্রবৃত্তি সবল থেকে সবলতর হয়ে উঠছে কই? সমস্ত কিছুর প্রতি ভ্রূক্ষেপহীন হয়ে উঠছে কই? উঠছে! উঠছে!

সে বেরিয়ে এল। দাঁড়াল রাস্তার উপর। হ্যাঁ, উঠেছে। রাস্তার আলো শতগুণ ঝলমলে হয়ে উঠেছে। মনের সংযম সংকোচ কুঁকড়ে ম'রে আসছে। পতঙ্গভুক ফুলের মত নেশা তাদের গ্রাস করছে প্রজাপতির মত। না না না। ডোণ্ট টক ননসেন্স।

কাব্য ক'রো না মানিক—অর্থাৎ শ্রীমান বিমলচন্দ্র। শ্রীশিল্পী মহাশয়। উপমাতে এ বিজ্ঞানের যুগে গোলমাল ক'রো না চাঁদ। বল, বুকের কামনার ফসলে ফুলে যে সংযম আর লজ্জার কীটগুলো উপদ্রব সুরু করেছিল—তাদের উপর তেজস্কর ওষুধ দিয়ে তাদের মেরে দেওয়া হ'ল।

এবার ফুটুক ফুল। ফণিমনসার ফুল ফুটুক। নিশীথ রাত্রে ফুটুক নাগকেশর। এসে দাঁড়াল সে এসপ্লানেড। লোক কম হয়ে এসেছে। ন'টা বাজছে। দাঁড়িয়ে চারিদিক তাকিয়ে দেখলে। কই? তারা গেল কোথায়? অধীর হয়ে উঠেছে সে। কত ঘুরবে? কত অপেক্ষা করবে?

এসে দাঁড়াল কালীঘাটের ট্রাম। ভায়া আলিপুর। সে উঠে পড়ল ট্রামে। কালীঘাটের মন্দির যাবার পথের দুধারে এরা দাঁড়িয়ে থাকে। এরা নিজেরাই ডাকে। এদের লজ্জার ভণ্ডামি নেই, ভদ্র সাজার ভান নেই, বেশভূষায় পুরুষকে আকর্ষণ করা ছাড়া ওদের শিক্ষিতা সম্ভ্রান্ত ব'লে নিজেদের জাহির করার কোন মানসিক জটিলতা নেই। চল কালীঘাট।

কিন্তু আশ্চর্য! এখানেও যেন কে তার গলা টিপে ধরছে, পা দুর্বল ক'রে দিচ্ছে। অথচ সে বার বার এদিক থেকে ওদিকে হাঁটছে। হাঁ ক'রে তাকিয়ে দেখতে দেখতে হাঁটছে। দুপাশের বড় দোকানগুলি বন্ধ হতে সুরু করেছে। ছোট দোকানগুলির বিক্রী কম—তারা ওকে লক্ষ্য করছে। হাসছে।

—কি মশাই? দেখতে পান না?

একজনের সঙ্গে ধাক্কা খেয়েছে। সে দ্রুত হাঁটতে লাগল। একটা সরু গলির মোড়ে ক'টি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু বিশ্রী। ওই একজন শ্রীমতী মেয়ে রয়েছে কিন্তু সকলের পিছনে। সামনেই একটি স্থূলাঙ্গিনী, পুরুঠোঁট কালো মেয়ে তাকে ডাকছে, হাসছে।

সে চলল আবার।

মেয়েটি পেছনে গলি থেকে মুখ বাড়িয়ে বললে—মরণ!

সে ক্রুদ্ধ হয়েই একবার পিছন ফিরে তাকালে। পর-মুহূর্তেই বুকে একটা ধাক্কা খেলে সামনের দিক থেকে।—বচ যাইয়ে বাবু! বচ যাইয়ে! কেয়া—নিদ যাতে যাতে পথ চলতা হ্যায়? অাঁ?

পিছন থেকে কেউ একজন তাকে ধ'রে টেনে সরিয়ে নিলে।

উঃ! একখানা মহিষের গাড়ির সামনে প'ড়ে গেছে। এক পাশের মহিষটার মুখের ধাক্কা লেগেছে তার বুকে। গাড়িওয়ালা ভেবেছিল—লোকটি অবশ্যই পাশে স'রে যাবে। বিমল গাড়িখানাকেই লক্ষ্য করে নি। সে উন্মত্তের মত খুঁজছিল তার ক্ষুধার খাদ্য। ধাক্কা লেগেছে। সঙ্গে সঙ্গে গাড়োয়ান দড়ি টেনে মহিষটাকে আটকেছে। পিছনে একজন তাকে ধ'রে প'ড়ে যাওয়া থেকে বাঁচিয়ে পাশে টেনে নিয়েছে।

—ক্যায়সা আদমী! অাঁ?—প্রশ্ন করলে গাড়োয়ানটা।

—যাও। যাও। গাড়িকা পানে নজর নেহি থা।—ব'লে উঠল একজন পানওয়ালা। হেসে উঠল সকলে। একজন বললে—বোঁ ক'রে ঢুকে যাও বাবা, বোঁ ক'রে।

গ্রাহ্য করলে না বিমল। তার সব খোলস ছিঁড়ে খ'সে গিয়েছে।

চলল সে এগিয়ে। এবার সে সামনে যেখানে এদের কাউকে পাবে, সেইখানেই—।

এই যে! পাশেই ক'টি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটু অন্ধকারে। সে গিয়ে দাঁড়াল সামনে। ওই যে—ওই লম্বা দেখতে, পাতলা শরীর, চুলগুলি কোঁকড়া, চোখ দুটি ডাগর, কালো রঙ। হোক কালো রঙ, শরীরে তার রক্তধারার বেগ প্রবল হয়ে উঠল। এগিয়ে গেল সে।

—শোন। তোমাকে বলছি।

—কি?

—কি নেবে?

—পাঁচ টাকা।

—দেব।

—এস।

—দাঁড়াও।

—কি হ'ল?

—দাঁড়াও না।

কিসের বাজনা বাজছে? একদল লোক আসছে—গান গাইতে গাইতে, ঢোলক বাজিয়ে।

—এস না।

—দাঁড়াও।

অদ্ভুত লাগছে। কালো নগ্নদেহ মানুষ সব। মাথায় পাগড়ী। ঢোলক বাজাচ্ছে, নাচছে, গান করছে। একজন লোক রাস্তায় গড়াগড়ি দিয়ে আসছে। মধ্যে মধ্যে উঠছে আবার হাত জোড় ক'রে মাথার উপর তুলে শুয়ে পড়ছে। ও তো আকৃলু!

আকৃলু জমাদার! বিমলের পাড়াতেই কাজ করে। ওদের পাড়ার ঝাড়ুদারদের মাতব্বরশ্রেণীর লোক। বিমলের কাছে মধ্যে মধ্যে দরখাস্ লিখিয়ে নেয়।

আকৃলু জমাদার ধুলোয় গড়াগড়ি দিয়ে কোথায় চলেছে!

তিন পাশে ঘিরে ওর স্বজাতিরা—ঢোল বাজাচ্ছে, নাচছে।

কৃপা কর, পাপ নাশো, মায়ী—হো! মাগো!

—কি রকম মানুষ তুমি গো? দাঁড়িয়ে ঢঙ দেখছ।

বিমল একখানি পাঁচ টাকার নোট বের ক'রে তার হাতে দিয়ে বললে—টাকাটা নাও।

—তুমি আসবে না?

—না। হ্যাঁ। একটু দাঁড়াও না। দেখি।

এবার মেয়েটি হেসে বললে—ওর কি দেখবে?

তখন ওদের দল এসে পড়েছে সেখানে। আকৃলু দাঁড়িয়ে উঠে আবার সাষ্টাঙ্গে প্রণত হচ্ছে। তার মুখের দিকে চেয়ে কি হয়ে গেল বিমলের।

যখন খেয়াল হ'ল, তখন—।

বিমল বললে—তখন আমি মন্দির-প্রাঙ্গণে।

অমরেন্দ্র বললে—কি হুইস্কি খেয়েছিলি? দেশী, না, বিলিতী? হুইস্কির সঙ্গে বিয়ার আগে কখন খেয়েছিলি, না,সেই প্রথম?

জবাব দিলে না বিমল। নিজের কথাই ব'লে গেল।

—আমি আকৃলুর মুখে সে দিন আশ্চর্য মহিমা দেখেছি। শুধু তাই নয়, দেখলাম মন্দিরের মধ্যে দেবতার মুখেও সেই মহিমা। আকৃলুর ছটা সেখানে গিয়ে পড়েছে, কিন্তু সে ছটা দেবতার নিজস্ব হয়ে গেছে। আমার কি হয়ে গেল।

ব্যঙ্গভরে অমরেন্দ্র বললে—কি হয়ে গেল?

—প্রকাশ করা যায় না! তবে সে এক অপূর্ব অনুভূতি। আমি অনুভব করলাম, আমি বিশ্বসংসারের সঙ্গে মিলিয়ে গিয়েছি, মিশে গিয়েছি, একাত্ম হয়ে গিয়েছি। দেহের রোম-কূপে রোমাঞ্চ হ'ল। সকল শিরায়, শোণিতে, স্নায়ুতে, একটা আনন্দময় আচ্ছন্নতা নেমে এল! আমি যেন ঘুমিয়ে যাচ্ছিলাম, আমি যেন হারিয়ে যাচ্ছিলাম। মনের মধ্যে শুধু রবীন্দ্রনাথের এককলি গান—সত্যি সত্যি যেন কেউ ফিরে ফিরে গেয়েই চলেছিল—'আমি

তোমারই সঙ্গে বেঁধেছি আমারই প্রাণ, সুরের বাঁধনে, তুমি তো জান না আমি পেয়েছি তোমারে অজানা সাধনে।'

স্তব্ধ হ'ল বিমল, হঠাৎ আবার বললে—আমি ওই সেই মুহূর্তের আস্বাদ পাবার জন্যে এখানে আসি।

—শিবেনদার বুদ্ধের ছবিতে জ্যোতির্মণ্ডল আঁকিস নি?

—না। ওই আস্বাদ যে দিন আবার পাব সেদিন আঁকব। সে দিন সমস্ত রাত্রি হতচেতন হয়ে ছিলাম। কাজ করতে পারি নি। আঁকব। এবার যে দিন সেই মুহূর্ত ফিরে পাব, সেই দিন আঁকব।

অমরেন্দ্র বললে—আর একদিন হুইস্কি আর বিয়ার খেয়ে আসিস।

—না।

জটায়ু

অস্বাভাবিক মৃত্যু হ'লেই পুলিস এসে লাশ নিয়ে জেলার সদরে চালান দেয়। সে লাশ যায় জেলার বড় হাসপাতালে, সেখানে সিবিল-সার্জেনের তত্ত্বাবধানে লাশ কেটে পরীক্ষা ক'রে দেখা হয়, মৃত্যু সঠিক কিসে বা কি কারণে ঘটেছে। সাপে কাটা, জলে ডোবা, গাছ থেকে পড়া, কি গাছ চাপা পড়া—এই সব ধরনের মৃত্যুতে ইউনিয়ন-বোর্ড-প্রেসিডেন্টরা নিঃসন্দেহ হয়ে সার্টিফিকেট দিয়ে সৎকারের হুকুম দিতে পারেন, কিন্তু গলায় দড়ি থেকে খুন-খারাপি পর্যন্ত ওতে তাঁদের হাত নাই। সে লাশ চালান দিতেই হবে। কারণ কে বলতে পারে, বিষ খাইয়ে মেরে শেষ পর্যন্ত গলায় দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে দেয় নি! অস্ত্রাঘাতেও বোঝা যায়, আঘাতটা পরে করেছে, না নিজে করেছে অর্থাৎ খুন না আত্মহত্যা, সেটা ডাক্তারেরা অস্ত্রাঘাতের ধরন দেখে বুঝতে পারেন।

কাজেই দুটো লাশই চালান দিলেন দারোগা।

জটে পাগলা এবং কালী বা কালা গুণ্ডার লাশ।

জটে পাগলার পাঁজরায় একটা গভীর ক্ষত-চিহ্ন। কাঁধে হাতে আরও তিন-চারটে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে, তবে বুকের আঘাতটাতেই তার মৃত্যু ঘটেছে এতে কারুর সন্দেহ রইল না। কালা গুণ্ডার বড় ছোরাটাও রক্তমাখা অবস্থায় তার হাতের কাছে প'ড়েও ছিল। সুতরাং কালা গুণ্ডাই তাকে খুন ক'রে থাকবে। কালা গুণ্ডা একটা অসুর, কালা গুণ্ডা একটা রাক্ষস, একটা দৈত্য, যা বল সে তাই। তার পক্ষে একটা প্রৌঢ় পাগলকে খুন করা কি এমন ব্যাপার! খসখসে কালো রঙ, মাথায় ঝাঁকড়া চুল, তেমনি দাঁড়ি-গোঁফ, থ্যাবড়া নাক, ঠোঁটের উপর বেরিয়ে-পড়া দুটো বড় বড় দাঁতওয়ালা ছ'ফুট লম্বা কালা গুণ্ডা—এ অঞ্চলে ত্রাস ব'লে পরিগণিত ছিল। মায়েরা দুষ্ট ছেলেকে ভয় দেখাত—ওই কালা গুণ্ডা আসছে! কালা গুণ্ডা না-হয় জটে

পাগলাকে খুন করলে; কিন্তু কালাকে কে মারলে? কালার গলায় একটা গভীর ক্ষত-চিহ্ন। এক পাশে চারটে, এক পাশে পাঁচটা আঙুল গভীরভাবে যেন ঢুকে গিয়েছিল। কেউ যেন নখ দিয়ে ওর গলাটা ছিঁড়ে দিতে চেয়েছিল। সে কি জটে পাগলা? হয়তো সে-ই। আর কে হবে? জটের আঙুলে বড় বড় নখ প্রায় আধ ইঞ্চি লম্বা। নখে এবং আঙুলে রক্তও লেগে রয়েছে। তবুও বিশ্বাস হয় না।

কি ক'রে হবে?

মনে পড়ছে যে, ১৯৪৭ সালে কালা গুণ্ডা প্রথম দিন এ অঞ্চলে পা দিয়েই ত্রাসের সৃষ্টি করেছিল। তার হাতে সেদিন ছিল চিমটে। চিমটে ঘুরিয়ে 'চে—ৎ চ—ণ্ডী—' চীৎকার ক'রে ভাসতোড়ের এনতাজ মিয়ার বুকের কাছে চিমটেটা নিয়ে গিয়ে বলেছিল—জিভ বের কর্ মা, খেয়ে নে রক্ত! আশে-পাশের লোক অনেক কষ্টে তাকে নিরস্ত করেছিল। এনতাজ মিয়া হাত জোড় ক'রে ক্ষমা চেয়ে বলেছিল—আমার ভুল হয়েছে। না না, সে আপনি নয়।

ব্যাপারটা ঘটেছিল এই। সে দিন হঠাৎ কালার আবির্ভাব হ'ল। পরনে গেরুয়া বহির্বাস ঘাড়ে ফেরতা দিয়ে বাঁধা, গলায় রুদ্রাক্ষ, তার ওপর একটা হলদে ব্যাগ, কাঁধে ঝোলা, হাতের চিমটে হাতের লোহার বালার সঙ্গে ঠুকে শব্দ তুলে এসে হাঁকলে—আরে শুনো হিন্দু, ব্রাহ্মণ আর চণ্ডাল—সব জাত শুনো, প্রভু বিশ্বনাথকে হুকুমৎ। লে আও চন্দা! চাঁদা আনো! চাঁদা!

—চাঁদা!

—হাঁ। চাঁ-দা—। হিন্দুকে বাঁচানেকে লিয়ে চন্দা। বাবা বিশ্বনাথকে হুকুমৎ। হিন্দুকে ধরম যাচ্ছে। পাঁচ হাজার—দশ হাজার কলকাত্তা, নোয়াখালি, জেনানীর ইজ্জত, হিন্দুর ধরম বচানোকে লিয়ে চান্দা। আঢ়াই শও রূপেয়া লে আও।

ঠিক এই সময়েই সাউগা ভাসতোড়ের এনতাজ মিয়া ওই পথ ধ'রেই যাচ্ছিল বায়েনপাড়া। এনতাজ চামড়ার ব্যবসা করে, দু-তিনটে জেলা ঘুরে চামড়া কিনে চালান দেয়—গতিবিধি তার সর্বত্র। সে কালাকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে বলেছিল—আরে, তুমি না সেই ফকির!

—হ্যাঁ, হম সন্ন্যাসী ফকির।

—না না, মুসলমান ফকির! মুরশিদাবাদের শেখের পাড়াতে সেদিন—মুসলমানদের বাঁচাতে হবে পয়গম্বরের হুকুমৎ, কায়েদে আজমের ফরমান নিয়ে এসেছ তুমি—ব'লে চাঁদা তুলছিলে না? আর আজ এখানে এসেও হিন্দুকে বাঁচাতে হবে ব'লে—

সঙ্গে সঙ্গে হুঙ্কার দিয়ে উঠল কালা গোঁসাই। তখনও তার গুণ্ডা খেতাব আবিষ্কৃত হয় নি। সে হুঙ্কারে আশেপাশের লোকজন চমকে উঠল।

—কেয়া রে বিধর্মী! আমি মুসলমানের জন্য চাঁদা তুলি? আমি মুসলমান?

গলার রুদ্রাক্ষের মালাটা দেখিয়ে, চিমটেটা ঘোরাতে সুরু ক'রে দিয়েছিল।—আ—আ! হে মহাদেব, বম্ বৈদ্যনাথ। কালী কালী মহাকালী—ভদ্রকালী কপালিনী অসুরনাশিনী! জিভ বের কর মা—খাও রক্ত, নাচ মা দিগম্বরী—হা—

সে এনতাজের মাথায় চিমটে বসায় আর কি! লোকজন ছুটে পালিয়েছিল, এনতাজও পালিয়েছিল তাদের সঙ্গে। কিন্তু কালা গোঁসাই তাতে মানে নি। শেষে এনতাজ বলেছিল—আমার ভুল হয়েছে গোঁসাই। না না, সে তুমি নও।

গড় গড় ক'রে গায়ত্রী মন্ত্র ব'লে গিয়ে কালা গোঁসাই বলেছিল—আমি মুসলমান? ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরি নিভং। আমি মুসলমান? জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিনী। আমি মুসলমান? খুন করব তোকে।

—আমি মাফ চাচ্ছি, আমার ভুল হয়েছে।

—হ্যাঁ। মাফ তুমকো নেহি করতা, লেকিন—একটা সত্যি কথা বলেছিস—তাতেই তো'কে মাফ কর দিয়া। শুনো বেওকুফ হিন্দুলোক, গিধ্বর বুরবক ভেড়ীকে জাত, শুনো। কেয়া বোলা হয়ে শেখ। মুসলমানরা চাঁদা তুলছে। ফকির এসে চাঁদা তুলে ঘুরছে। পল্টন তৈয়ার করেগা। হাঁ। হিন্দু ভেড়ী লোক, সমঝ লেও। সোহি বাত—বিশ্বনাথজী সেই কথা ব'লে আমাকে

পাঠিয়েছেন। বদ্রীনাথ আস্থানের ওপারে মহাবীরজীর—হনুমানজীর আশ্রম, হনুমানজী বলেছেন আমাকে—যাও, চন্দা উঠাও। পল্টন তৈয়ার করো। যে হিন্দু চন্দা নেহি দেগা, উ বরবাদ জায়েগা। ঘরে আগুন লাগবে, সাঁপে কাটবে। মাথামে বজ্রাঘাত হোবে। হাঁ। লে আও চন্দা! আঢ়াই শও রূপেয়া—ইয়ে গাঁওকে চন্দা!

এর পর চাঁদা না দিয়ে উপায় কি? চাঁদা এসেছিল, কিন্তু আড়াই শো নয়—পঞ্চাশ টাকা কয়েক আনা। কালা গোঁসাই বলেছিল—আচ্ছা, কিস্তিতে শোধ নেব।

শুধু ওই গাঁয়েই নয়, আশপাশ সকল হিন্দু গাঁয়েই চাঁদা তুলেছিল। সঙ্গে জন কয়েক চ্যালাও জুটেছিল—ঘোঁতনা হাজরা, লাট্টু চৌধুরী, গণ্ডার ঘোষ, তাদের সঙ্গে গাইয়ে গাঁজাল জগা পর্যন্ত।

ভারতবর্ষ তখন সদ্য সদ্য ভাগ হয়েছে এবং স্বাধীন হয়েছে। নানা দিকে নানান গোলযোগ। ওদিকে পূর্ব-পাকিস্তান থেকে অনবরত লোক আসছে। হৈ-হল্লা করছে। পুলিসের প্রতাপ কমেছে। তবুও একদিন এই সব খবর পেয়ে দারোগা এসে হাজির হ'ল।

জিজ্ঞাসা করলে—কি নাম?

—হম হ্যায় কালা গোঁসাহী।

—কালা গোঁসাহী?

—হাঁ হাঁ। ভৈরব। কালভৈরব।

—বাড়ি কোথায়?

—বাড়ি তো কৈলাস। আস্তানা কাশী।

—এ সব কি ব'লে বেড়াচ্ছ? আর লোকজনের কাছে চাঁদা আদায় করছ কেন?

—বিশ্বনাথ প্রভু, মহাবীরজী, কালভৈরবের হুকুম।

—ও সব চলবে না। চালান দেব আমি।

হা-হা ক'রে হেসে উঠেছিল কালা গোঁসাই।—আরে! চালান দেগা? বাঁধে গা? কি দিয়ে বাঁধবে? হাতকড়ি? হা—হা—হা—হা! থু—থু—

দারোগার আর সহ্য হয় নি। বলেছিল—লাগাও হাতকড়ি।

হাত বাড়িয়ে কালা গোঁসাই বলেছিল—লাগাও।

কনস্টেবলটা ভয়ে ভয়েই হাতকড়ি লাগিয়েছিল। লাগাবার পরেই কালা গোঁসাই 'জয় কালী' ব'লে চেঁচিয়ে উঠে বন্দী হাত দুটোয় একটা ঝটকা দিয়ে কি যে করলে লোকে ঠাওর পেলে না ; কিন্তু পর-মুহূর্তেই দেখলে, এক হাতের একটা হাতকড়ার বাঁধন খুলে গেছে ; হাতকড়াটা ঝুলছে এক হাতে। মোট কথা, কালা গোঁসাইকে বাঁধা যায় নি। কিন্তু হাতকড়া খুললেই পুলিসের হাত থেকে খোলা পাওয়া যায় না। পুলিস তাকে ওখানকার সব থেকে বড় গ্রাম নবগ্রামে ধ'রে নিয়ে গেল। স্থির করলে, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিদ্বেষ-প্রচারের অপরাধে চালান দেবে। কিন্তু হাঙ্গামা হুজ্জুত অনেক, সাক্ষী-সাবুদ চাই, সকল লোকের সমর্থন চাই। এই সব ভেবে-চিন্তেই দারোগা তাকে ছেড়ে দিলে। তবে ব'লে দিলে—দেখ, এ সব কথা আর ব'লো না। সাজা হয়ে যাবে। এবার আমি ছেড়ে দিলাম। এর পর আর ছাড়ব না।

কালা গোঁসাই বললে—ঠিক হ্যায় বে বাবা। যাও, তুমি নিদ্ যাও।

ব'লেই সে রাস্তায় নেমে এসে হাঁকলে—বোম্ মহাদেও টন্ গনেশ, ভেজো সত্তু মুন সমেত।—চেৎ চণ্ডী !

এবং নবগ্রামেই সে একটা গাছতলা'য় তার চিমটেটা পুঁতে তার সামনে ব'সে গেল। দিন দুয়েক ধ্যানস্থ হয়ে ব'সে থেকে হঠাৎ তিন দিনের দিন চীৎকার ক'রে উঠল—যজ্ঞ, যজ্ঞ হবে। শান্তিযজ্ঞ। হাঁ। দেশের বিলকুল অশান্তি দূর হয়ে যাবে। শান্তিযজ্ঞ। হিংসা দূর হবে। অন্নকষ্ট দূরে যাবে। হিন্দুস্থান পাকিস্তানমে শান্তি আয়েগা। উঠাও চন্দা।

আর কিন্তু চাঁদা উঠল না। তখন কালা গোঁসাই শিব স্থাপন করলে এবং ধুনি জ্বাললে। চ্যালা জনকয়েক আগেই জুটেছিল—ঘোঁতনা হাজরা, লাট্টু চৌধুরী, গণ্ডার ঘোষ ; এদের সঙ্গে নবগ্রাম থেকে জুটে গেল বাসের ক্লীনার ইস্কাপন, গাঁজাল গাইয়ে ভোলা, উদাসী গোবিন্দে, রাইস্ মিলের ফিটার—বিলাইতিরাম এবং আরও জন কতক। তার মধ্যে ছিঁচকে চোর হাবলা ছিল এবং দুজন গুলিখোরও ছিল, তাদের মধ্যে একজন মুসলমান। আর জুটেছিল

পরম বায়েন। পরম বায়েন গ্রামের দেবস্থলে ঢাক বাজাত, পাকী মদের ভক্ত ছিল সে। পরম সকাল-সন্ধ্যা দু বেলা কালী গোঁসাইয়ের শিবতলায় ঢাক বাজাতে সুরু করলে। দিন কয়েক পরেই বেগুনি-ফুলরির দোকানদারনী রামদুলারী এসে গড় ক'রে বললে—মহাদেওজীর স্বপন মিলেছে তার, সাধু মহারাজের বড় কষ্ট হচ্ছে, একটা চালা বানিয়ে দিতে হবে আর ধুলো-মাটিতে ব'সে থাকতে মহাদেও পরভুর বড গা ঘিন্‌ঘিন্ করছে—একটি বেদী বাঁধিয়ে দিতে হবে। এখন সাধু মহারাজের হুকুম চাই।

কালী গোঁসাই বললে—ভাগ্‌ ভাগ্‌ যা। নেহি মাংতা। তু তো পাপিনী হায়।

ছোটখাটো মাথায়, মুখে বসন্তের দাগ—রামদুলারীকে লোকে পাপিনীই বলত। রামদুলারীর নাকি বাচ্চা চোরের দল আছে। দশ-বাবোটা ভিখারী ছেলে—তারা ঘাট থেকে বাসন তুলে আনে, দুপুরবেলা বাড়ি ঢুকে শুকুতে-দেওয়া কাপড় নিয়ে আসে, ফাঁক পেলে ঘরে ঢুকে ফুলদানিটা, কলমটা, এটা-ওটা নিয়ে আসে। রামদুলারী সত্যই দুষ্ট লোক।

রামদুলারী গোঁসাইয়ের পা জড়িয়ে ধরলে।—হুকুম দাও সাধুজী মহারাজ! রামদুলারীকে প্রায়শ্চিত্ত করতে দাও।

ভক্তদের অনুরোধে গোঁসাই সম্মতি দিলে। বেশ চমৎকার একটি স্থান তৈরী হয়ে গেল আটটি পাকা থাম গেঁথে তার উপর খড়ের চাল দিয়ে—একদিকে চার হাত লম্বা, দু হাত চওড়া, এক হাত উঁচু সিমেণ্ট দিয়ে মাজা বেদীর উপর ত্রিশূল পুঁতে, তারই গায়ে লম্বাটে শিবঠাকুরকে বসানো হ'ল। খুব ঘটা ক'রে ঢাক বাজাল পরম বায়েন। পুজো হ'ল। একটা পাঁঠা এনে বলি দিলে ঘোঁতনা হাজরা। লোকজন জমল অনেক। তার মধ্যে থেকে হঠাৎ টেঁপী ঠাকরুণ তারস্বরে বললে—সর্ রে, সর্ রে। অ রে অ মুখপোড়ারা, সর্ না রে! দেখি! বাবা উঠলেন। দেখি!

নবগ্রামের টেঁপী বা টঁ্যাপা ঠাকরুণ দেবভক্তি এবং পুণ্যের জন্য বিখ্যাত। নবগ্রামের কোন দেবতা বলতে পারে না যে, টঁ্যাপা ঠাকরুণের আগে কেউ তাকে কোনদিন প্রণাম করেছে বা তার থেকে জোরে মাথা ঠুকে প্রণাম

করেছে। ট্যাপা ঠাকরুণ প্রণাম করলে ঠক-ঠক শব্দ ওঠে। কপালের ঠিক মাঝখানে একটা টাকার আকারের গোল কালচে রঙের আব আছে। সেটা ওই প্রণাম ক'রে ক'রেই সৃষ্টি হয়েছে।

স'রে গেল লোকজন; ট্যাপা ঠাকরুণ খুঁট খুলে একটি পয়সা ফেলে দিয়ে প্রণাম ক'রে বললে—তা বেশ হ'ল। একটি নূতন বাবা হলেন। তা বাবার নামটি কি গোঁসাই? অ্যাঁ? বাবাকে পূজোর ফলটাই বা কি?

কালা গোঁসাই বললে—আমি কালী গোঁসাই, শিব তা হ'লে কালিকেশ্বর।

—চমৎকার নাম। কালিকেশ্বর। বেশ নাম। তা ফলটা বল?

—ফল আবার কি? ফল পুণ্য, ফল ধর্ম।

—উঁহু। শুধু পুণ্যি ধর্ম—সে তো ঘরে ব'সেই হয় গো। তার লেগে এতটা পথ হাঁটলাম কেন? ওই দেখ, মনসাতলায় গরল ভাল হয়, ওই তোমার কলেরা হ'লে রক্ষেকালী রক্ষে করেন। তার পরেতে তোমার ষণ্ডেশ্বর বাবার পুষ্পে গো-মড়ক ভাল হয়। কি বলে, এলোকেশী মায়ের মহিমায় টাকপড়া বন্ধ হয়। তা তোমার শিবের একটা মহিমে তো চাই বাবা!

—হাঁ। উ মহিমা বাবা মহাদেও নিজসে দেখাইয়ে দিলেন গো! শুধাও তো রামদুলারীকে। চুরির পাপ খণ্ডন করে মা। কোই চোরি কিয়া—বাস্, সওয়া পাঁচ আনা আঁধিয়ারামে রাখ দিয়ো বাবাকে আস্তানামে—বাস্, বিলকুল পাপ খণ্ডন হোগা।

—তা বেশ, তা বেশ। তা ওর সঙ্গে আর একটি মহিমে কর বাবার। এই দেখ, এই গরমের সময় সারা গায়ে ঘামাচির জ্বালায় মরি। চুরির পাপ-ক্ষয়ের দক্ষিণে সওয়া পাঁচ আনা, তা ঘামাচিতে তখন পাঁচ পয়সাই ঢের। তা পাঁচ পয়সা আমি দেব, বাবা যদি আমার ঘামাচি নিবারণ করে। ঘামাচি ধর সবারই হয়। তুমি তোমার শিবকে বল—ওই মহিমাটি ধরুন উনি।

কালী গোঁসাই সঙ্গে সঙ্গে একমুঠো ধূনির ছাই তুলে ট্যাপা ঠাকরুণের হাতে দিয়ে বলেছিল—একটু হলুদের সঙ্গে মিশিয়ে নিয়ে গায়ে মেখো। বাস্। দেখো বাবার মহিমা।

ওই ঘামাচির মহিমাতেই কালী গোঁসাইয়ের শিবস্থান জ'মে উঠেছিল। দিনের বেলা ঘামাচি পীড়িত মেয়ে-পুরুষের ভিড় জ'মে যেত। রাত্রেও জমত। সে ওই রামদুলারী যে পাপমোক্ষণ-ফল প্রাপ্ত হয়েছে, সেই ফলের প্রত্যাশীরা এসে জমত। সে আনাগোনা জমজমাট রাত্রিকালে অর্থাৎ অন্ধকারে লোকচক্ষুর অগোচরে। মাঝরাত্রে বা শেষরাত্রে তারা এসে ওই সওয়া পাঁচ আনা হিসাবে পয়সা রেখে যেত। এই পয়সার পরিমাণ যত বেশী হতে লাগল, ততই যে অঙ্কুলটায় চুরি বাড়ল সে কথা বলাই বাহুল্য। ওদিকে কালী গোঁসাইয়েরও চেহারা বের হতে লাগল। লোককে গালিগালাজ অপমান, ক্রমে চড-চাপড-ঘুষি, গলা টিপে ধ'রে শাসানো—নিত্যকারের ঘটনা হয়ে দাঁড়াল। থানার দারোগা আবার চঞ্চল হ'ল। একদিন এসে হাজির হ'ল কালা গোঁসাইয়ের ওখানে। সঙ্গে আর একটি ভদ্রলোক। লোকটিকে দেখেই গোঁসাই প্রায় ক্ষেপে লাফ দিয়ে উঠল। কিন্তু তার আগেই ভদ্রলোক এবং দারোগা দুজনেই দুটো পিস্তল বের ক'রে ধরলেন—খবরদার!

কালা গোঁসাই কুৎসিত ভাষায় গাল পাড়তে লাগল। সে শোনা যায় না, কানে আঙুল দিতে হয়। কিন্তু গোঁসাইয়ের সে বাছ-বিচার নেই। গ্রাহ্যও নেই। এমন কি পুলিসের গুঁতোও দু-দশটা পডল, তবুও গ্রাহ্য করল না।

—আরে, আমি হলাম নেপাল গুণ্ডা। ওই গুঁতায় আমার কি হবে? শালা, দেখ্ রে, হামারা শিব কেতনা ডাণ্ডা খায়া—দেখ্। দেখ্ রে বে পিঠ, ছোরাকে দাগ। খুলনেতে একবার শডকি চালাইছিল—জানুতে বইসা ফিনিক মাইরা খুন ছুটল—অ্যাই এত্যানি ঠাই ই-ফোঁড উ-ফোঁড়! দাগ•• রইছে। ক ঘা রুলের গুঁতায় কি অইব রে হালা!

লোকের সন্দেহ হয়েছিল, কিন্তু এতখানি না। ওই আগন্তুক ভদ্রলোকটি সি. আই ডি ইন্‌স্‌পেক্টর। খবর পেয়ে এখানে এসেছেন। এসে দেখেন, কালা গোঁসাই—কলকাতার বিখ্যাত নেপাল গুণ্ডা, ওকে গুণ্ডা-আইনে প্রথম কলকাতা থেকে, পরে বাংলাদেশ থেকেই বের ক'রে দেওয়া হয়। বেহারে গিয়ে নেপাল হয় কালা গুণ্ডা। সেখান থেকে যায় পূর্ববঙ্গে, সেখানে নাম নিয়েছিল—কাল্লু সর্দার। রাহাজানি, নৌকায় ডাকাতি, মেয়েছেলে চুরি—অনেক করেছে সেখানে। দেশ ভাগ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এখানে চ'লে এসেছে। এ অঞ্চলে এসে হয়েছে কালী গোঁসাই বা কালা গোঁসাই।

দারোগার সঙ্গের ভদ্রলোকটি কলকাতার ডিটেকটিভ ডিপার্টমেণ্টের লোক। এখানকার দারোগা কালা গোঁসাইয়ের বিবরণ কলকাতায় পাঠিয়েছিল। লিখেছিল—এই সাধুপুরুষের আবির্ভাবে এখানে চুরি-ডাকাতি বেড়েছে, সুতরাং সাধুর অতীত সাধনার বিবরণ যদি কিছু তাঁদের জানা থাকে তবে সেটা জানালে তাঁর সুবিধে হয়। তাঁর আকার-প্রকার জানাবার জন্যে গোঁসাইয়ের একখানা ফোটোগ্রাফও তিনি পাঠিয়েছিলেন। সেই পেয়েই ওই ভদ্রলোক হাজির হয়েছিলেন।

যাই হোক, কালা গোঁসাই গ্রেপ্তার হয়ে চালান হ'ল। কিন্তু মাস কয়েক পরেই আবার—কালী কলকাত্তাওয়ালী—হাঁতমে ভোজালি—লড়ে হালি হালি—বম্ শঙ্কর—বম্ শঙ্কর—ব'লে ফিরে এসে ফের ব'সে গেল আপনার ঠাকুরতলায়।

বললে—কেয়া করেগা পুলিস? আমি হলাম মা কালীর ছেলে, বাবা শিবের বেটা। আমার কি করবে? মা-বাবাতে স্বপ্ন দিলে—ছেড়ে দে। বাপ বাপ ব'লে ছেড়ে দিলে। আরে মুই কি আপনা লেগ্যা কিছু করছি, যা করছি ধর্মের লেগ্যা—দশের লেগ্যা করছি। কালা গোঁসাইকে পাপ ছুঁতে পারে না। হাঁ। বোম্ শঙ্কর—বো—ম্। এবং এর পর থেকে গোঁসাই শুধু গোঁসাই থাকল না, গোঁসাই-বাবা হয়ে উঠল। বিক্রম-পরাক্রম শতগুণে বেড়ে গেল।

রাস্তায় ভিড় জ'মে আছে, গোঁসাইয়ের হাঁক উঠল—বোম্ শঙ্কর। হরণ করো পাপ। শীতল করো তাপ! ঘামাচি বিলকুল ভালা করো বাবা!

সঙ্গে সঙ্গে রাস্তার ভিড় দু দিকে স'রে গেল। রাস্তা হয়ে গেল গোঁসাইয়ের জন্য। কেউ নড়তে দেরি করলে গোঁসাই তার মাথায় মারলে গাঁট্টা, বললে—কেয়া রে অধর্মী!

গোঁসাই হাটে গেল। সেখানে গিয়েই মারলে হাঁক—কালী কলকাত্তা-ওয়ালী হাতমে ভোজালি—লড়ে হালি হালি। ঘামাচি-মারণ পাপ-হরণ বাবা কালিকেশ্বর শিবের জন্যে বেটী রান্না চড়িয়ে ব'সে আছে বাবা সব। দেও তোলা। আন সব্জী।

কারও ডালা থেকে বেগুন, কারও ডালা থেকে মুলো, কারও কাছ থেকে কুমড়ো, কারও কাছ থেকে লাউ আলু কপি নিলে টেনে তুলে এবং সঙ্গের চেলার ঝুড়িটায় চাপিয়ে আর বার দুই হাঁক দিয়ে চ লে এল।

একদিন একজন গোঁসাইয়ের হাতে ধরা লাউটা কাড়তে গিয়ে বলেছিল—না, ওটা আমি দোব না। ওরে বাবা রে—আমি ম'রে যাব। না—না।

বাস্, সঙ্গে সঙ্গে গোঁসাইয়ের হাতের চিমটে উঠে গেল। অবশ্য লোকটার মাথায় মেরে মাথা ফাটিয়ে জেল যাবার মত বেকুব গোঁসাই নয়—সে চিমটে চালালে তার লাউয়ের গাদার উপর। দুম্-দাম।—লাউগুলি একেবারে কেটে কেটে ছেত্‌রে গেল।

এতেও বার-কয়েক ধরা পড়তে হয়েছে কালা গোঁসাইকে। কিন্তু কোনটাতেই দণ্ড হয় নি। কালা গোঁসাইয়ের ডাণ্ডার ভয়ে কেউ সাক্ষী দিতে রাজী হয় নি। যারা পুলিসের ভয়ে আদালতে গিয়েছে, তারা সেখানে গিয়ে সব গোলমাল ক'রে দিয়েছে।

এই হ'ল কালা গোঁসাই।

না। হ'ল না। কালা গোঁসাইয়ের শক্তি এবং সাহসের কথা না বললে হবে না। কালা গোঁসাই লাঠি মেরে একটা ক্ষ্যাপা মহিষের শিঙ ভেঙে দিয়ে তাকে ঠাণ্ডা করেছে। একটা কুকুর পাগল হয়ে দশ-বারোটা লোককে কামড়েছিল, সেটা কালা গোঁসাইকে পথে পেয়ে তাড়া করেছিল; গোঁসাইয়ের হাতে এক লোটা ছাড়া আর কিছু ছিল না। গোঁসাই সেই লোটার এক ঘায়েই পাগলা কুকুরটার মাথা ফাটিয়ে মেরে ফেলেছিল।

এই হ'ল কালা গোঁসাই।

এই কালা গোঁসাইকে কি জটে পাগলা মেরে ফেলেছে? এ কি হতে পারে?

জটে পাগলা প্রায় জন্মপাগল। ইদানীং একেবারেই পাগল হয়ে গিয়েছিল। শিবু কর্মকারের ছেলে; শিবুর অবস্থা খুব ভাল নয়, তবে মোটা ভাত, মোটা কাপড় আছে। কিন্তু জটে বাড়িতেই থাকত না। ঘুরে বেড়াত—এখান সেখান ক'রে। বিশ-বাইশ বছর বয়স পর্যন্ত সে বাড়িতে থেকেছে, সে সময় পর্যন্ত বাপের সঙ্গে কামারশালায় খেটেছে। বড় সাঁড়াশী দিয়ে বাপ ধরত জলন্ত লোহা, সে পিটত তার উপর হাতুড়ী। বড় হাতুড়ী। শেষ পর্যন্ত গরুর গাড়ির চাকার হাল বসাতে সে ধরত সাঁড়াশী আর চাষীরা মারত হাম্বর। কাজটা সহজ ব'লে ওইটেই ওর বাপ ওকে ছেড়ে দিয়েছিল। সকলে বলত—পাগলা কিন্তু জোয়ান হবে ভাল। তাই হয়েওছিল। বিশ-বাইশ বছর বয়সে জটে একেবারে লোহার মানুষ হয়ে উঠল। তারপরই জটের মাথার গোলমাল বাড়ল। গোলমাল বাড়ল বাবুদের থিয়েটার দেখে। 'সীতাহরণ' পালা দেখে কেঁদে একেবারে সারা। সীতা সেজেছিল কলকাতার একটি ছেলে। যেমন তাকে মানিয়েছিল, তেমনি সে পার্ট করেছিল। রাম সেজেছিল এই গ্রামেরই শিবনাথ। সেও পার্ট করেছিল ভাল। রাত্রে অভিনয় দেখে জটে আর বাড়ি ফেরে নি, বাকি রাতটা ওই ফাঁকা আসরেই ব'সে কেঁদেছিল। সকালবেলাতেই বোঝা গেল, ওর মাথার গোলমাল বেড়েছে। সাহাদের উমেশকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে তার হাতখানা খপ ক'রে চেপে ধ'রে বললে—পাষণ্ড মিথ্যুক কাপুরুষ।

উমেশ অবাক এবং আশপাশের লোকেরা অবাক। হ'ল কি? উমেশ বললে—ছাড়্ ছাড়্, লাগে—লাগে।

—লাগে? বদমাস! নির্লজ্জ! মরার ভান ক'রে প'ড়ে থেকে তোর বাঁচতে লজ্জা হ'ল না?

—কি বলছিস? যা গেল।

—কি বলছি? পাষণ্ড, তুই রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ তা হ'লে প্রাণ দিয়ে করিস

নাই ? মিছে ক'রে ম'রে গিয়েছি দেখিয়ে প'ড়ে রইলি ? আর সীতাকে হরণ ক'রে নিয়ে গেল রাবণ ?

উমেশ জটায়ু সেজেছিল। জটায়ুর আত্মদান জটেকে মুগ্ধ করেছিল। উমেশকেই সে প্রণাম করেছিল বার বার। চীৎকার ক'রে বলেছিল—বলিহারি উমেশ ! বলিহারি ! বাঃ ভাই, বাঃ ! মহাপুণ্য তোমার—মহাপুণ্য !

তাই আজ উমেশকে জীবিত দেখে সে ক্ষেপে গিয়েছে। তা হ'লে ও সত্যকারের যুদ্ধ করে নি ! প্রাণ বাঁচাবার জন্য মিছিমিছি ম'রে যাবার ভান ক'রে প'ড়ে গিয়েছিল—রাবণ মড়া ভেবেই তাকে ছেড়ে দিয়েছে। ওরে পাষণ্ড ! ওরে কাপুরুষ ! তোর প্রাণের মায়াটাই এত বড় হ'ল রে ?

লোকে হেসে সারা হ'ল। অনেক বুঝিয়ে বললে—যাত্রা-থিয়েটারে যা হয়, তা কি সত্যি হয় রে ? সব মিছে।

এর পর থেকে সে শিবনাথের বাড়ি আনাগোনা স্থরু করলে। শিবনাথকে তার বড় ভাল লেগেছে। রাম ! সে রাম !

শিবনাথ শুধু রাম নয়, শিবনাথ এখানকার গ্রামের মুকুটহীন রাজা। সাধারণ ঘরের ছেলে। লেখাপড়া শিখেছে—এম. এ. পাস। এখানকার সকল কল্যাণজনক অনুষ্ঠানের সে নেতা। বিয়ে করে নি। এই নিয়েই আছে। যেমন মিষ্ট কথা তেমনি সুন্দর তার চেহারা।

শিবনাথের বাড়ি গিয়ে সে ধরলে—সেও থিয়েটারে পার্ট করবে।

শিবনাথ কাউকে দুঃখ দিয়ে ফিরিয়ে দেয় না। 'না' বলতে তার মুখে বাধে। সে বললে—দেব, পার্ট দেব তোকে।

জটে উৎসাহিত হ'ল এবং সঙ্গে সঙ্গে সে তার গুণপনারও পরিচয় দিলে অভিনয়ের ভঙ্গিতে বক্তৃতার সুরে—কে রে ? কে রে ? কে রে কামাতুর—পাপাচারী পিচাশ—

শিবনাথ সংশোধন ক'রে দিলে—পিচাশ নয়, পিশাচ।

—পিশাচ ! আচ্ছা। কে রে কামাতুর পাপাচারী পিশাচ—নিষ্কলঙ্ক স্বর্ণপ্রতিমা শুচিতার প্রতিমূর্তি—নবনীততনু দেবীকে হরণ ক'রে নিয়ে যাচ্ছিস ?—কে ?

তারপর হঠাৎ চমকে উঠে বললে—চিনেছি—ওরে দুরাত্মা—ওরে ব্যভিচারী—চিনেছি চিনেছি তোরে। পাপাচারী লঙ্কাপতি—রাক্ষস রাবণ। রামের ঘরণী তুই করিলি হরণ? কিন্তু রক্ষা নাই তোর। গড়ুরের পুত্র আমি—জটায়ু আমার নাম। বৃদ্ধ আমি—তবু আজও নখর প্রখর মোর। নখর-আঘাতে তোর দশ মুণ্ড করিব ছেদন!

পার্ট তার প্রায় মুখস্থ হয়ে গেছে। শুধু তাই নয়, এমন ক্রুদ্ধ ভঙ্গি ক'রে রোষ-ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললে যে, সে যেন সত্যই জটায়ু।

তারপর ভাঙা গলায় কাতবভাবে মুমূর্ষুব মত শিবনাথের সামনে হাত জোড় ক'রে বললে—সম্মুখে দাঁড়াও তুমি রাম, হে বিশ্বের জীবনাভিরাম দূর্বাদলশ্যাম, ওহে মনোহর!

থবথব ক'বে কাঁপতে লাগল তার কণ্ঠস্বর।

শিবনাথেব ভারি ভাল লাগল। সত্যিই পাগলা অভিনয় করতে পারে। কাল অভিনয়ে উমেশ যা করেছে, যেমন ভাবে বলেছে—তার থেকে সত্যই ভাল, প্রাণবন্ত। সে প্রশংসাই করলে। বললে—তাই তো রে! সত্যিই তো তুই খুব ভাল বক্তৃতা করতে পারিস! এ তো চমৎকার!

জটে বললে—তা হ'লে আমাকে ওই পার্টটা দাও। বেটা উম্‌শা—কাপুরুষ বিশ্বাসঘাতক। ও মরে নি। দিব্যি বেঁচে আছে। সকালবেলা দেখলাম একটা কাঠি চিবিয়ে দাঁতন করছে। আজ আমি জটায়ু হব।

শিবনাথ বললে—ওরে সর্বনাশ! সত্যি সত্যি মরবি নাকি?

—তা না হ'লে কি ক'বে জটায়ু হব?

—তা হ'লে পুলিসে রাবণকে ধ'রে নিয়ে যাবে যে।

—তুমি রাম, তুমি ভগবান, তুমি রাজা—তুমি বারণ ক'রে দিয়ো। বলো, জটায়ু স্বর্গে গিয়েছে। যুদ্ধ ক'রে মরেছে। ও পার্ট আজ আমি করবই।

—কিন্তু আজ তো আর 'সীতাহরণ' পালা হবে না জটাধর।

—হবে না? হতাশ হয়ে গেল জটাধর।

—না। আজ 'রাণা প্রতাপ' হবে।

—সে আবার কি পালা?

—খুব যুদ্ধ আছে। আমি শক্তিসিংহ সাজব।

এতে জটাধর বিন্দুমাত্র উৎসাহ বোধ করলে না। আস্তে আস্তে উঠে চ'লে গেল। রাত্রে থিয়েটার দেখতে এল। কিন্তু প্রথম দৃশ্যেই রাণা প্রতাপ ও শক্তিসিংহের ঝগড়া দেখে সে বিরক্ত হযে উঠল। বললে—একটা বুনো শূয়োর মেরেছে, তাই নিয়ে ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়া! ব্রহ্মহত্যে হয়ে গেল! রাম! রাম! এই আবার দেখে!

ব'লে সেই অভিনযের মধ্যেই উঠে দাঁড়িয়ে ছোট ভাই গঙ্গাধরকে ডেকে বললে—চল্ রে গোঙা, বাড়ি চল্। রাত হয়েছে, ভাত খেযে শুবি চল্। ই আর দেখতে হবে না।

চ'লে গেল সে।

* * *

শিবনাথের বাড়ির পথই সে আর মাড়াল না। মাস কয়েক পরে শিবনাথই তাকে ডাকলে। আবার অভিনয় হবে। জটাধরের অভিনয়ের শক্তি আছে, তাকে সে পার্ট দেবে। জটাধরেব মাথাটা তখন অপেক্ষাকৃত সুস্থ রয়েছে, এবং পার্ট সে ভালই করলে সেবার। সকলেই তারিফ করলে জটাধরের। বললে—ওরে, এ যে ধুকুড়িব ভেতর খাসা চাল! ক্ষ্যাপা যে বেড়ে অভিনয় করে! অ্যাঁ!

জটাধর ঘাড নেডে বললে—জটায়ুব পার্ট যদি দিত দেখতে। দেখিয়ে দিতাম এক হাত!

এর পর জটাধব থিয়েটার থিযেটার ক'রেই পাগল হ'য়ে উঠল।

শিবনাথের বাড়ি নিত্য হাজিরা দেয় এবং প্রশ্ন করে—আবার কবে থিয়েটার হবে, তা বল।

মধ্যে মধ্যে বলে—এই দেখ, রাম সাজলে তোমাকে যেমন মানায় তেমন কিছুতে মানায় না। তুমি আর একবার 'সীতাহরণ' পালাটা কর। আমি একবার জটায়ু সাজি। একবার দেখিযে দি।

ব'লেই আরম্ভ করে—কে রে? কে—রে কামাতুর পাপাচারী পিশাচ? আরে—আরে—চিনিয়াছি তোরে। পাপাচারী লঙ্কাপতি রাক্ষস রাবণ।

শিবনাথ হাসে।

জটাধরও হাসে এবং হাসতে হাসতেই শিবনাথের পাখানি টেনে নিয়ে টিপতে সুরু ক'রে বলে—রামচন্দ্র, এবার তুমি বিয়ে কর। সীতা আন ঘরে।

শিবনাথ বলে—জটা, ওটা আর কপালে নেই। বুঝলি, হরধনু ভাঙবার ক্ষমতা নেই। অভাবের লোহাতে গড়া ধনুক, ও ভাঙতে আমার সাধ্যি নেই।

হঠাৎ কিন্তু অঘটন ঘ'টে গেল। অভাবের লোহায় গড়া ধনুকখানা সত্যিই ভেঙে ফেললে শিবনাথ। নিজেও জানতে পারলে না, কেমন ক'রে কি হ'ল। হঠাৎ রাতারাতি বিখ্যাত লোক হয়ে গেল। শুধু তাই নয়, অভাব ঘুচে টাকার বাজারে দাম বেড়ে গেল তার। সে হ'ল ওই থিয়েটার থেকে।

শিবনাথের এক বন্ধু সিনেমায কাজ করত; সে একখানা ছবিতে ডিরেক্টার হয়ে গেল। সেই ওকে টেনে নামালে ছোটখাটো একটা ভূমিকায়। শিবনাথের তাতেই নাম হয়ে গেল। চেহারাটা ছিল ভাল, তার উপর অভিনয় হ'ল সবার সেরা; বাস্, তার পরেই দুটো ছবিতে আরও দুটো পার্ট ক'রে তিনটের বেলায় হয়ে গেল হিরো।

এক বছর পর শিবনাথ যখন দেশে ফিরল, তখন সে বিখ্যাত ব্যক্তি তো বটেই, উপরন্তু অভাব তার ঘুচে গেছে। এক বছরে চারখানা ছবিতে সবশুদ্ধ পাঁচ-ছ হাজার টাকা রোজগার করেছে এবং দশ-বারো হাজার টাকার কণ্ট্রাক্ট পেয়েছে। চেহারা পর্যন্ত পাল্টে গেছে তার।

গ্রামের লোক প্রায় ভিড় ক'রে তাকে দেখতে এল। জটাধরও এল। সকলেই শিবনাথকে অভিনন্দিত ক'রে ফিরে গেল। ব'সে রইল জটাধর।

জটাধরের চেহারা দেখে শিবনাথ চমকে উঠল।—এ কি চেহারা হয়েছে জটাধর?

জটাধরের ঠোঁট দুটো কাঁপতে লাগল। চোখে জল এল। সে বললে—তুমি এত নিষ্ঠুর! আমাকে ফেলে তুমি চ'লে গেলে! এরা আমাকে আর পার্ট দেয় না। বলে—পাগল।

জটাধরের মাথা আবার খারাপ হয়েছে। শরীর শীর্ণ হয়েছে, মাথার চুল উস্কোখুস্কো, ময়লা কাপড় জামা—জামা নয়, একটা গেঞ্জি। ঘরের কাজকর্ম করে না, শুধু ঘুরেই বেড়ায়। বলে—দেখবে দেখবে। যাব কলকাতা। রামচন্দ্র এলে হয়। সিনেমায় নামব। বড্ড নাম হবে।

শিবনাথকে বললে—আমি পার্ট করতে পারি না? উম্‌শা আমার চেয়ে ভাল পার্ট করে? তুমি বল! কই সে বলুক, আমার মত!

ব'লেই আরম্ভ করলে—কে রে? কে—রে কামাতুর পাপাচারী পিশাচ? আরে—আরে চিনিয়াছি—চিনিয়াছি তোরে। পাপাচারী লঙ্কাপতি রাক্ষস রাবণ!

শিবনাথ তাকে সান্ত্বনা দেবার জন্যই বললে—পার্ট তুই সত্যিই ভাল করিস জটাধর।

—তবে আমাকে নিয়ে চল তোমার সঙ্গে।

—কলকাতায়?

—হ্যাঁ।

এ কথার কি জবাব দেবে শিবনাথ? মিথ্যা সান্ত্বনা দিতে সঙ্কোচ হ'ল তার। সে চুপ ক'রে রইল। জটাধর ডাকলে—রামচন্দ্র!

—না রে, ও-সব জায়গা ভাল নয় জটাধর। সে সব জায়গা বাবুদের। বাবুরা সেখানে চাষী সাজে, মুটে সাজে। চাষী মুটে যারা সত্যিকারের, তাদের তারা নেয় না।

—তুমি একবার আমাকে একটা পার্ট দিয়ে দাও। তা পরে আমি দেখে নোব।

—আচ্ছা দেখব।

দিন কয়েক থেকেই শিবনাথ চ'লে গেল। জটাধর বললে—তোমার চিঠি পেলেই আমি চ'লে যাব। চিঠি দিয়ো।

শিবনাথ বললে—দেব। অবশ্য নিতান্তই সান্ত্বনা-বাক্য।

জটাধব তারপর নিত্য যেত পোস্ট-আপিস।—আমার চিঠি আছে পিওন—জটাধর কর্মকার?

—নাই।

পরের দিন আবার।

—নাই।

আবার পরের দিন।

—নাই।

—মিছে কথা—ভাল ক'রে দেখ। মাস্টারবাবু, তোমার পিওন নিশ্চয় আমার চিঠি মেরেছে।

মাস্টার ধমক দিয়ে বললে—ভাগ্ পাগলা। পাগলামির আর জায়গা পাও নি!

কে যেন একজন রসিকতা ক'রে বললে—হায় প্রভু রামচন্দ্র—দূর্বাদলশ্যাম! তুমিও বঞ্চনা করলে—দীন ভক্ত জটায়ু অধমে! হায় রাম!

মুহূর্তে কি হয়ে গেল জটাধরের। একটা চীৎকার ক'রে উঠল আহত পশুর মত এবং ছুটে পালিয়ে গেল গ্রাম থেকে।

বেরিয়েছিল সে কলকাতা যাবে ব'লে। কিন্তু মাস দুই-তিন পর বাড়ি ফিরল বদ্ধপাগল হয়ে। গ্রামের প্রান্তে, রাস্তার ধারে ব'সে থাকত। চীৎকার ক'রে থিয়েটারের পার্ট বলত। মধ্যে মধ্যে যেত থিয়েটারের বর্তমান পাণ্ডা দেবকুমারবাবুর কাছে।

—'সীতাহরণ'টা একবার করুন। শিবনাথ রাম—আমি জটায়ু। পাঁচ টাকা দোব আমি। ভিক্ষার টাকা থেকে সত্যিই সে পাঁচ টাকা জমিয়ে রেখেছে।

—আর কলকাতার লোকেদের নেমন্তন্ন করুন। তারা দেখে যাক, শিবনাথ রাম করে ভাল, না, আমি জটায়ু করি ভাল! আমাকে নিশ্চয় নিয়ে যাবে তারা। আমি যা রোজগার করব তার অর্ধেক থিয়েটার পার্টিকে দোব। করুন একবার ঐ পালাটা।

দেবকুমার বলে—বিরক্ত করিসনে বাপু। যা, এখান থেকে যা।

শেষ পর্যন্ত বলে—বেরো বলছি।

এই জটে পাগলা। শেষ পর্যন্ত নখে-চুলে, দাঁড়িতে-গোঁফে বীভৎস হয়েছিলচেহারা। দেহ হয়েছিল শীর্ণ। জটে খেত না ভাল ক'রে।

এই জটে পাগলা কালা গোঁসাইকে হত্যা করতে পারে, এ কি সম্ভব?

* * *

শিবনাথ জেলা-ম্যাজিস্ট্রেটকে বললে—তাই হয়েছে শ্রীযুত বোস। আমি বলছি আপনাকে।

যেদিন সকালে কালা গোঁসাই এবং জটে পাগলার লাশ চালান গেল, সেই দিন বিকেলবেলা শিবনাথ এল গ্রামে। খবর পেয়ে সে ছুটে গেল সদরে। একা নয়, সস্ত্রীক। শিবনাথ মাস কয়েক আগে বিয়ে করেছে। মাস খানেক আগে বউ নিয়ে এসেছিল গ্রামে। বউটি সুন্দরী শিক্ষিতা মেয়ে, গান গায় ভাল। বউ নিয়ে গ্রামে এসে সে বেশ সমারোহ ক'রে খাইয়েছে লোকদের।

জটাধরও এসেছিল।

চুপি চুপি শিবনাথকে বলেছিল—খাসা সীতা হয়েছে রামচন্দ্র। এইবার সেই পালাটা একবার কর। আমি দশ টাকা জমিয়ে রেখেছি। বুঝেছ?

শিবনাথ বলেছে—হবে। তুই পেট ভ'রে খা।

পেট ভ'রে খেয়ে সে শিবনাথের বউকেও তার পার্ট শুনিয়েছিল। বলেছিল—তুমি বল রামচন্দ্রকে। বুঝেছ মা!

শিবনাথের বউ বলেছিল—বলব। কিন্তু হেসেছিল।

জটাধর রাগ ক'রে চ'লে গিয়েছিল।

শিবনাথ ম্যাজিস্ট্রেটকে বললে—আমাকে হঠাৎ যেতে হয়েছিল কলকাতা। জরুরী কাজ। এক ঘণ্টার মধ্যে রওনা হতে হ'ল। সেই কারণে আমার স্ত্রী রইলেন। কথা রইল, কাজ সেরে ফিরে এসে ওকে নিয়ে যাব। ওঁর ধনুকভাঙা পণ—এখানে একখানি ছোট বাড়ির পত্তন না ক'রে যাবেন না। গ্রামের প্রান্তে যেখানে জটে এবং কালা গোঁসাই মরেছে, তার খানিকটা এ দিকে আমার বাড়ির জায়গা ঠিক করেছিলাম। যেদিন আমি গেলাম, সেদিন স্টেশনের পথে জটাধরের সঙ্গে দেখা হ'ল। বললাম—হ্যাঁ রে, রাগ করেছিস?

রাগই সে করেছিল। আমার কথার জবাব দিলে না।

বললাম—রাগ করিস নে। আমার বউয়ের ঐ স্বভাবটা মন্দ। কথা বলতে গিয়ে হেসে ফেলে। ওই জন্যে ওকে পার্ট দেয় না।

সে বললে—রিহারশ্যাল দাও। সেরে যাবে। আমি ধমক দিয়ে সারিয়ে দেব। তুমি পালা ধর।

শিবনাথ বললে—তাড়াতাড়ি ছিল আমার, আমি বললাম, আমি ফিরে আসি, এসে তাই করব।

জটাধর বললে—কোথায় যাবে তুমি?

—কলকাতা।

—সীতা?

শিবনাথ ম্যাজিস্ট্রেটকে বললে—তারপর শুনুন আমার স্ত্রীর কাছে। বল কল্যাণী।

শিবনাথের স্ত্রী কথা বলতে গিয়ে যেন বলতে পারছে না। তার ঠোঁট দুটো কাঁপছে।

শিবনাথ বললে—সংকোচ ক'রো না। সংকোচের এতে কিছু তো নেই।

শিবনাথের স্ত্রী কল্যাণী আঁচলের খুঁট আঙুলে জড়াতে জড়াতে বললে—এখানে এসে এ গ্রাম আমার বড় ভাল লেগেছে। লাল মাটি, খোলা মাঠ আর এখানকার রাত্রের আকাশ দেখে আমার কেমন যেন মনে হয়, আমি যেন হারিয়ে যাই! তাই আমি জেদ ধরেছিলাম, এইখানে বাড়ি কব। গ্রামের ভিতর পুরনো বাড়িতে নয—গ্রামের শেষে খোলা মাঠের ধারে। যে বাগানটায় এই কাণ্ড ঘটেছে, সেই বাগানটার ধারে ওঁর খানিকটা জমি আছে, সেইখানটাই আমার পছন্দ হ'ল। ওঁকে টেনে আমিই নিয়ে গেলাম ইঁটের ঠিকাদারের কাছে, রাজমিস্ত্রীদের ডাকলাম। তা ছাড়া, ওঁকে সঙ্গে নিয়ে গ্রামের বহু জায়গা দেখে বেড়ালাম। ওঁর ছেলেবেলার প্রিয় জায়গাগুলি দেখালেন উনি। যে জায়গায় কালা গোঁসাই তার আস্তানা পেতেছিল, সেই জায়গায় ছিল ওঁদের ছেলেবেলার ভয়ের জায়গা। বলতেন, ফুটবল খেলে ফেরবার সময় ওই জায়গায় ওঁরা প্রায় চোখ বুজে জায়গাটা পার হতেন। ওখানে নাকি ভূত ছিল। ওখানেই দেখলাম কালা গোঁসাইকে। কালা গোঁসাই এসে ওঁকে বললে—আরে বেটা, তুমি নাকি ভারি আমীর আদমী! সিনেমামে পার্ট করো? তুমার বহু? ও করে?

উনি বললেন—না।

কালা গোঁসাই বললে—আমাকে জান তুমি? আমি কালা গোঁসাই।

—নাম শুনেছি।

—তা কালিকেশ্বর শিবের পূজা তো কিছু দাও। খুব তো লোককে খাওয়ালে দাওয়ালে।

একটা টাকা উনি দিলেন।

পরের দিন সকালে উনি বন্দুক বের ক'রে সেটাকে পরিষ্কার করছিলেন। কথা ছিল, ওখান থেকে দু ক্রোশ দূরের বিলে শিকার করতে যাব। কালা গোঁসাই এল। বললে—বন্দুক? শিকার?

উনি হেসে বললেন—হ্যাঁ। কিন্তু তোমার আবার কি খবর? কি মনে ক'রে?

গোঁসাই বললে—একনলা বন্দুক, কিন্তু কি রকম গড়ন? এটা কি? এ রকম তো দেখি নি!

আমি বললাম—ওটাতে টোটা পোরা থাকে, একসঙ্গে পাঁচটা। বার বার টোটা পুরতে হয় না। একসঙ্গে পর পর পাঁচবার গুলি ছোঁড়া যায়।

—আ! আচ্ছা! খুব ভাল বন্দুক। তুমি ছুঁড়তে পার?

—পারি, কিন্তু তোমার খবর কি গোঁসাই?

—তুমি খুব ভাল আদমী। তোমার কাছে এলাম। তুমি বাড়ি করবে শুনলাম?

—হ্যাঁ। কে বললে তোমাকে?

সে কথার জবাব না দিয়ে গোঁসাই বললে—ওই নীরদ ঠিকাদারকে ঠিকা দিয়ো না তুমি।

—কেন?

—উঁহু। ওকে আমি বললাম, শিবের দরবারে ঢুকবার পথের মুখে দুটো থাম বানিয়ে একটা ফটক বানিয়ে দাও। উ দিলে না। ওকে ঠিকা তুমি দেবে না। আমি তোমাকে রাজমজুর দোব—কাজ দেখে দোব। ভাল কাজ সস্তায় ক'রে দোব। তুমি শিবের দরবারে থাম ফটক বানিয়ে দেবে।

উনি বললেন—আমি ওকে কথা দিয়েছি গোঁসাই। সে হয় না।

—না না। আমার কথা শুনতে হবে তোমাকে।

—তোমার কথা শুনতে হবে? উনি একটু চ'টে উঠলেন। কেন বল তো?

—আমি কালা গোঁসাই। বাবা শিবের হুকুম।

উনি ভুরু কুঁচকে তার দিকে চেয়ে বললেন—বিরক্ত ক'রো না গোঁসাই, যাও তুমি এখান থেকে। তুমি এখানে অনেক উপদ্রব করছ আমি শুনেছি। আমার নামও তুমি জান। আমি আজ সিনেমার কাজে বাইরে থাকি, কিন্তু এখানে আমি অনেক উপদ্রব বন্ধ করেছি। তুমি নিশ্চয় শুনেছ!

—আ—চ্ছা! কালা গোঁসাই উঠে দাঁড়াল। তারপর বললে—শিব তোকে দণ্ড দেবে। আমাকে দোষ দিস নে।

উনি হেসে বললেন—কি হবে? গাময় ঘামাচি?

কালা গোঁসাই বললে—নন্দীর ত্রিশূলের মুখে বন্দুক তোমার বাত বলবে না। এ আমি ব'লে দিলাম।

একটু চুপ ক'রে রইল শিবনাথের স্ত্রী।

তারপর বললে—ও কথাটা আমাদের কারুরই মনে ছিল না। কালা গোঁসাই মধ্যে মধ্যে বাড়ির সামনে দিয়ে যেত আসত। কিন্তু আর ঝগড়া-টগড়া করে নি।

উনি হঠাৎ সেদিন টেলিগ্রাম পেয়ে চ'লে গেলেন। আমাকে বললেন—একলা থাকতে পারবে তো?

বললাম—খুব পারব।

এত বড় গ্রাম—এ গ্রামে চুরি, তাও ধান চুরি, কাপড় চুরি, ঘাট থেকে বাসন চুরি ছাড়া আর কখনও কিছু হয় নি। ভয় বলতে অসুখের আর ভূতের। ওঁর ডাক্তার-বন্ধু রয়েছেন; সকলে ভালবাসেন; আর ভূতের ভয় আমার নেই। তা ছাড়া, ওঁর বন্ধুদের উনি ব'লে গেলেন।

আমি একলাই বেড়ালাম দুদিন।

সেদিন ছিল বোধ হয় পূর্ণিমার পরদিন। কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ হয়তো বা

দ্বিতীয়া প'ড়ে থাকবে। পূর্ণিমার দিন থেকে আমাদের বাড়ির ইঁট আসছিল এখানে। ঠিকেদার নীরদবাবু আর দেবকুমারবাবু এসে বললেন—চলুন বউদি, ইঁট গুনে দেখব। আপনাকেও গুনতে হবে।

ইঁট গোনা হ'ল। সন্ধ্যে হয়ে গেল; পুবদিকে সোনার থালার মত চাঁদ উঠল। আমিই বললাম—বসুন একটু। চাঁদ উঠছে, দেখি।

দেববাবু বললেন—তা হ'লে গান শোনান।

অনুরোধ ঠেলতে পারলাম না, গাইলাম। দেখতে দেখতে জ্যোৎস্নায় হেসে উঠল চারিদিক। সেই জ্যোৎস্নার মায়াতে যেন আচ্ছন্ন হয়ে গেলাম। একখানার পর আর একখানা—আবার একখানা গাইলাম।

হঠাৎ এক ভয়ঙ্কর মূর্তি এসে সামনে দাঁড়াল। আমি চমকে উঠলাম। দেববাবু ধমক দিয়ে বললেন—কে?

সে বললে—আমি জটাধর, দেবুভাই।

—জটে?

—হ্যাঁ। ব'লে বসল সে। তারপর বললে—এমন সুন্দর গান গায় আমাদের সীতা, তা সে পালাটা একবার করবে না? আমার সাধটা একবার মেটাবে না?

দেববাবু বললেন—পাগলামি করিস নে জটে, বাড়ি যা। আজকাল শুনি বাড়ি যাস নে, যেখানে-সেখানে মাঠে-ঘাটে প'ড়ে থাকিস!

জটাধর বিড় বিড় ক'রে বললে—বাড়ি? বাড়ি? উঁহু! উঁহু! বাড়ি আমার কোথা আবার? বললাম পালাটা করতে, তা করবে না তোমরা, তা ক'রো না।

তারপরই বক্তৃতা সুরু করলে—কে রে—? কে রে তুই কামাতুর—পাপাচারী নিষ্ঠুর পিশাচ?—ব'লে চ'লে গেল সে বাগানের ভিতর দিয়ে।

আরও একটা গান গেয়েছিলাম। তারপর ফিরলাম বাড়ি।

আমাদের বাড়ি যাবার একটা সোজা পথ আছে। সেটা গলি-পথ। বাড়ীর চণ্ডীমণ্ডপের ভিতর দিয়ে। দরজাটা চণ্ডীমণ্ডপের দিকেই মুখ ক'রে।

ওঁরা আমাকে চণ্ডীমণ্ডপের সামনে পৌঁছে দিলেন। আমি বললাম—আর আসতে হবে না। ওঁরা চ'লে গেলেন। আমি চণ্ডীমণ্ডপে ঢুকলাম। আমার শ্বশুরকুলের চণ্ডীমণ্ডপ। ওঁর ঠাকুরদাদাদের পাঁচ ভাইয়ের প্রতিষ্ঠা করা পাঁচটি শিবমন্দির পাশাপাশি উঠেছে। লোক নেই, জন নেই—খাঁ-খাঁ করছে। মন্দিরের প্রদীপগুলি নিবে গিয়েছে। শরিকেরা গরীব হয়ে গিয়েছে। দেখলাম, শ্যাওলা-ধরা মন্দিরের গায়ে চাঁদের আলো প'ড়ে যেমন লজ্জা পাচ্ছে তেমনি লজ্জা দিচ্ছে। উপরের কলসগুলি কালো হয়ে গিয়েছে। আমি দাঁড়িয়ে ভাবছিলাম, বাড়ি তৈরী আরম্ভ করবার আগেই এর সংস্কার করাতে হবে। কলসগুলি মাজাব, মন্দিরে চুনকাম করাব—

হঠাৎ পিছন থেকে কে আমার মুখ চেপে ধরলে। এক মুহূর্তে আশ্চর্য-কৌশলে মুখ বেঁধে, আমাকে তুলে ঘাড়ে ফেলে, গলি-পথ ধ'রে ছুটল। অলিগলি তার জানা। কোন্ গলি-পথ বেশি অন্ধকার, কোন্ গলিটা দুটো বাড়ির জলপড়া নালা—সে সব জানে। ওই নালার গলিপথ ধ'রে সে ছুটল। আমি চীৎকার করতে পারছিলাম না। তার শক্ত মুঠোয় দুখানা হাত যেন আমার ভেঙে যাচ্ছিল। শুধু পাচ্ছিলাম গায়ে গাঁজার উৎকট গন্ধ।

অনেকটা পথ এসে সে এক জায়গায় আমাকে ফেলে দিলে।

জায়গাটা আবছা অন্ধকার। বড় গাছের ছায়াতল। সে আমাকে ফেলে দিয়ে হি-হি ক'রে হেসে উঠল। দেখলাম, কালা গোঁসাই।

বীভৎস হাসি, কুৎসিত দৃষ্টি। সে বললে—হাম কালা গোঁসাই। হাঁ! বন্দুক কোথা? বন্দুক? পাঁচটা গুলি পর পর চলে? হাঁ। সিনেমাওয়ালী—আজ তুমকো লেকে ভাগেগা হম! হি-হি-হি! হি-হি-হি! হি-হি-হি! সে হাসতেই লাগল।

আমি ভয়ে বোবা হয়ে গেলাম। শরীরে বল ছিল না আমার।

সে আমার হাত ধ'রে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে চলল। এমন সময় হঠাৎ একটা বিকট চীৎকার উঠল—বিকট চীৎকার ক'রে অন্ধকার থেকে প্রেতের মত একটা মূর্তি এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল কালা গোঁসাইয়ের উপর—কে—রে—কে—রে?

দেখলাম, অতর্কিতে ধরলে সে কালা গোঁসাইয়ের গলার নলিটা চেপে।

চীৎকার করতে লাগল। আমি বুঝতে পারলাম—সে জটে পাগলা। জটায়ুর বক্তৃতা করছে।

কালা গোঁসাই কথা বলতে পারছিল না। এক হাতে সে জটের হাত ছাড়াতে চেষ্টা করছিল, অন্য হাতে সে কোমর থেকে ছুরি বার ক'রে তাকে মারবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু জটে পাগলের নিষ্ঠুর আক্রমণ, নিষ্ঠুর বজ্রের মত শক্ত হাতের মুঠি। সে যুদ্ধ নিষ্ঠুর যুদ্ধ। আমার মনে হ'ল, অমাবস্যার অন্ধকারে ঢেকে গেল পৃথিবী। আমি ভয়ে অজ্ঞান হয়ে গেলাম।

তারপর তখন কত রাত্রি তা জানি না। বোধ হয় দু'পহর পার হয়েছে। আমার জ্ঞান হ'ল। চাঁদ তখন মাথার উপর। জ্যোৎস্নার রঙ তখন নিটোল মুক্তোর মত ঝকঝকে সাদা। ঝলমল করছে চারিদিক। গাছের ফাঁক দিয়ে বাগানের অন্ধকারের মধ্যে টুকরো টুকরো জ্যোৎস্না এসে পড়েছে। বাগানের ভিতরের অন্ধকার ফিকে হয়ে এসেছে। তার মধ্যে দেখলাম—একদিকে প'ড়ে আছে কালা গোঁসাই, অন্য দিকে প'ড়ে আছে জটে পাগল।

হঠাৎ শিবনাথের স্ত্রীর চোখ থেকে গড়িয়ে এল দুটি জলধারা। সে বললে—পাগল নয়। সে জটায়ু।

সকলে স্তব্ধ হয়ে রইল কিছুক্ষণ। কল্যাণী বললে—আমি বাড়ি ফিরে এলাম। বাড়িতে ঝি-চাকর ভয় পেয়েছে। তারা জেগে ব'সে ছিল। আমি বললাম—জ্যোৎস্না দেখছিলাম। উনি বাড়ি আসতে সব বললাম।

শিবনাথ বললে—সৎকারের জন্য ওর শবটা আমি চাইতে এসেছি। ওর সৎকার করব আমি।

বিস্ফোরণ

ড্রাইভার অ্যাণ্ড কোম্পানি।

সন্ধ্যের মুখে কাকেরা যেমন একটা জায়গায় দল বেঁধে কলকল করে, তেমনিধারা রাত্রি দশটার পর জন দশ-বারো মোটর-ড্রাইভার আড্ডা জমিয়ে ব'সে যায়; প্রারম্ভেই খুব খানিকটা তর্কমুখর হয়ে ওঠে, তারপর নটবর ঢুকতেই সব চুপ ক'রে যায়। নটবর মাঝখানে বসে, সমস্ত শোনে, নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি হ'লে বিচার ক'রে দেয়, মনিবের সঙ্গে বিবাদের কথা হ'লে বলে—আচ্ছা, কাল যাব আমি। মনিব হয়েছে তো চারটে হাত গজিয়েছে না কি? সব ঠিক ক'রে দিব। ব'স—এখন ব'স। তারপর খানিক আমোদ-প্রমোদ, পান-ভোজন, সঙ্গীতচর্চা। তারপর জন কতক চ'লে যায় আপন আপন বাসার দিকে, জন কতক থাকে, তারা এই ড্রাইভার অ্যাণ্ড কোম্পানির আপিসেই থেকে যায়।

আপিস মানে একটা গ্যারেজ। ওই নটবরেরই মালিকের গ্যারেজ। উত্তর কলকাতায় বেশ ভদ্রপল্লীর মধ্যেই পাশাপাশি চারটে গ্যারেজ—তিনটিতে তিনখানা গাড়ী থাকে, একটা খালি—ওই খালিটাই ড্রাইভার কোম্পানির আপিস বা আস্তানা। সব গ্যারেজগুলিরই মালিক নটবরের বাবু। সেই কারণেই নটবর কোম্পানির স্থায়ী সভাপতি। শুধু সভাপতি বললেই নটবর কোম্পানির কি বুঝানো যায় না। একেবারে হিটলার। দুর্বিনীত হ'লেই নটবর প্রথম একবার ধমক দিয়ে ওঠে—অ্যাও রামা!

রামা অর্থাৎ রামতারণ।

রামার সেদিন মাথা খারাপ হয়েছিল। সারাটা দিন প্রচণ্ড দুর্ভোগ গেছে তার, বৈশাখী দুপুরে খিদিরপুর থেকে ফেরবার মুখে রেড রোডের মাঝ-পথে লঝ্ঝড় গাড়ীখানা ঘঁক্-ঘঁক্ ক'রে বার কয়েক ঝাঁকি দিয়েই দাঁত লেগে অজ্ঞান হয়ে পড়ার মত অনড় হয়ে গেল। বেলা তখন দুটো,

সেই দুটো থেকে বেলা সাড়ে তিনটে পর্যন্ত বনেট খুলে গরম ইঞ্জিনের অসহ্য তাপের মধ্যে বনেটের ভিতর মাথা গলিয়ে, অবশেষে ইঞ্জিনের তলায় ঢুকে রেড রোডের গলা পিচের উপর পাদানির ছেঁড়া রোঁয়া-ওঠা আস্তরণ বিছিয়ে তার ওপর শুয়ে, তেল কালি মেখে, ঘেমে নেয়ে উঠেও কিছু করতে পারে নি। অসহ্যগরম ইঞ্জিনটার গায়ে ঠেকে হাতের আঙুল থেকে কনুই পর্যন্ত গোটা দশেক ফোস্কা পড়েছে, কয়েক জায়গা কেটে গেছে। মেজাজ খারাপের আর অপরাধ কি?

রামতারণ বললে—আমার বরাতই শালা মন্দ! এত খেটে শেষকালে গাল খেলাম।

বাবু তাকে ইডিয়ট গাধা উল্লুক ব'লে গাল দিয়েছে। গাড়ীর মধ্যে ওই দুপুরের উত্তাপে বাবু সিদ্ধ হচ্ছিল—অবস্থা দাঁড়িয়েছিল ভাপে সিদ্ধ আস্ত একটি ভেড়ার মত। প্রথমটা গালাগাল দিচ্ছিল নিজের মন্দ বুদ্ধিকে এবং নিজের অদৃষ্টকে। সাত হাজার টাকা দিয়ে কেন সে এ পুরোনো আপদ কাঁধে চাপালে? বাইরেটা নতুনের মত চকচকে ঝক্‌ঝকে দেখে কারও সঙ্গে পরামর্শ না-ক'রে কাউকে না-দেখিয়ে কেন সে কিনলে? আর তার কি ভাগ্য? দশ দিন যেতে না যেতে অ্যাকসিডেন্ট! আঃ, যদি সেদিন দৈত্যের মত মিলিটারী লরীটা ওটাকে চুর ক'রেই দিত তবে সে রেহাই পেত। সে নিজেও পেত এই ভবযন্ত্রণা থেকে মুক্তি আর দু-দুটো ইনসিওরেন্সের পুরো টাকাটা ঢুকত ঘরে।

ঠিক এই সময়ে ওপাশ থেকে আসছিল একখানা গাড়ী—এ গাড়ীখানা থেকেও অনেক ঝরঝরে। টেরে বেঁকে চলেছে কিন্তু ঠিক। গাড়ীখানা থামল। গাড়ী থেকে নামল ময়লা পা-জামা আর হাফশার্ট পরা একজন পানবিড়িওয়ালা শ্রেণীর মুসলমান; বয়সও নিতান্ত অল্প। সেও গাড়ী-খানা থেকে নেমে গাড়ীর মালিক চালককে সেলাম ক'রে বললে, আর কুছ হবে না—ঠিক চ'লে যাবে।

গাড়ীখানা চ'লে গেল। ছোকরা এসে এ গাড়ীখানার কাছে দাঁড়াল।

—নেহি চলতা?

রামতারণ তার দিকে বিরক্তিভরে চেয়ে বললে—দিক মৎ করো।

ছোকরা কিন্তু কথা না-ব'লে বনেটের ভিতর চেয়ে দেখলে, তারপর বাবুর কাছে এসে বললে—হামি চালু করিয়ে দিবে বাবু?

—পারবে তুমি?

—ওই গাড়ীখানা বন্ধ হইয়েছিল, দিলাম চালু ক'রে। দশ মিনিটমে চালু কর দিবে। ফাইভ রুপিজ লেগা।

হাতে একটা থলি ছিল, সেটা সে খুলে ফেললে।

—আচ্ছা, তাই দেব। বাবু তখন অধীর হয়ে উঠেছে। ঘামে ভিজে পাঞ্জাবি গায়ে সেঁটে লেগে গিয়েছে।

রামতারণ এগিয়ে এসে বললে—কি হয়েছে আগে বল, তারপর গাড়ীতে হাত দেবে।

ছোকরা ফিক ক'রে হাসলে। বললে—পহেলে দেখনে দেও। থোড়া কুছ তো হুয়া—জরুর হুয়া। আভি ঠিক হো যায়েগা।

বার কতক এদিক ওদিক দেখে শেষে সে ইঞ্জিনের তলায় ঢুকে পড়লে, স্ক্রু-ড্রাইভারটা আর রেঞ্চ নিয়ে খুটখাট ক'রে বেরিয়ে এসে বনেটের উপর থেকে ঝুঁকে প'ড়ে দেখতে দেখতে বললে—স্টার্ট করো।

—স্টার্ট করো! একবার হাত দিয়েই স্টার্ট করো? রামতারণ তাকে ভ্যাঙালে।

ছোকরাটা অদ্ভুত। ভ্যাঙানিতেও রাগে না, হাসে। হাসাটাই ওর ভ্যাঙানির উত্তরে ভ্যাঙানি। একটু হেসে সে নিজেই এসে সেল্‌ফের বোতামে হাত দিলে। গাড়ীটা কোঁ-কোঁ শব্দ ক'রে খানিকটা ককিয়ে ঝাঁকি মেরে স্টার্ট নিলে। মরা যন্ত্রটার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সবল হয়ে উঠল। রামতারণ চকিত হয়ে উঠল। অস্ফুটস্বরে কাকে গাল দিলে, তা সে নিজেও বুঝলে না; কিন্তু দিলে গালাগাল।

ছোকরা স্টার্ট বন্ধ ক'রে আবার ফিরে এল বনেটের কাছে, ভিতরের দিকে ঝুঁকে দেখে নিলে; একটা বিদ্যুৎবাহী তার ধ'রে টানলে, আবার নিচে গিয়ে ঢুল, খুট খাট ক'রে নাট-বোল্ট-স্ক্রু এঁটে বেরিয়ে আবার স্টার্ট দিলে

মুহূর্তে সচল হয়ে উঠল গাড়ী, সে বললে—বাস্। ঠিক হো গেয়া, চলো মজাসে।

এতক্ষণে রামতারণ ব্যাপারটা বুঝেছে, সেল্ফের সঙ্গে তারের সংযোগটা খুলে গিয়েছিল বা এমনি আল্গা হয়ে গিয়েছিল। সে এবার বেশ স্ফুটকণ্ঠেই গালাগাল দিলে—যা, শালাঃ! সেল্ফের তারটা খুলে গিয়েছিল!

বাবু এবার বোমার মত ফেটে পড়ল—সেল্ফের তার খুলে গিয়েছিল! ইডিয়ট রাস্কেল কোথাকার! ড্রাইভারি করতে এসেছে!

ছোকরা হাসলে। বললে—এমন হয় বাবুজী। ওর দোষ নেই।

রামতারণ বললে—যাও যাও, তোমাকে ফোঁপরদালালি করতে হবে না।

বাবু তাকে পাঁচ টাকার নোট বের ক'রে হাতে দিলেন। বললেন—কি নাম তোমার? কোথায় থাক?

আমার নাম হুজুর ইসমাইল, হ্যারিসন রোডের কাছাকাছি থাকি। এই আমার কাম। হ্যারিসন রোডে এসে দাঁড়াই, গাড়ী অচল হয় চালু করি, সেই গাড়ীতেই খানিকটা এগিয়ে আসি, পথে দেখি গাড়ী অচল হয়েছে নেমে পড়ি। আপনার গাড়ীতে একটু হামি যাবে বাবুজী?

বাবু তাকে তুলে নিলেন। গাড়ী চলল। ধর্মতলায় এসে লোকটা বললে—একদফে রোখ্ না ভাইয়া। গাড়ীর দরজার হ্যাণ্ডেল সে তখন ঘুরিয়েছে। বাবু দেখলেন, একটা গাড়ী কয়েক জনে ঠেলে ফুটপাথের ধারে নিয়ে চলেছে।

গাড়ী থামতেই সে নেমে চ'লে গেল।

রামতারণ তাকেই এবার গাল দিলে—শালা!

বাবু ধমকে উঠলেন—উল্লুক কোথাকার! ওকে গাল দিচ্ছ কেন?

রামতারণের আর সহ্য হ'ল না, সে বললে—দেবে না গাল? একটা তার এঁটে দিয়ে পাঁচটা টাকা নিয়ে গেল! জোচ্চোর—

বাবু আবার ধমক দিলেন—মাথায় এক চাঁটি মারব তোর রাস্কেল।

রামতারণ বললে—আর আমি কাজ করব না আপনার। সে নেমেই পড়ল।

বাবু বললেন—টাকা অ্যাডভান্স নিয়ে রেখেছিস তুই। টাকা দিয়ে চ'লে যা।

—সে আমি দোব। হ'লে দোব। চাবি ফেলে দিয়ে নেমে চ'লে গেল। সেণ্ট্রাল অ্যাভিন্যু ধ'রে সে হন হন ক'রে হেঁটেই চলেছিল, হঠাৎ শুনতে পেলে তার অতি পরিচিত হর্নের শব্দ। দেখলে, ইসমাইল গাড়ী চালিয়ে যাচ্ছে। বাবু আরামে ব'সে সিগারেট টানছেন।

—শালা!

মনের জ্বালায় সে একটা সিগারেটের দোকান থেকে চার পয়সা দামের একটা সিগারেট কিনে ধরিয়ে একটা বাসে চেপে বসল। মিশন রো'র কাছাকাছি এসে মনে পড়ল, পকেটে ছিল চার আনা পয়সা, তার চার পয়সা গেছে সিগারেটে। আর চার পয়সা কি ছ পয়সা বাস ভাড়া দিলে থাকবে দু আনা বা ছ পয়সা। নেমে পড়বে? নাঃ। নটবর আছে, ড্রাইভার অ্যাণ্ড কোম্পানি আছে। তার ভয় কি!

সেই নটবরই তাকে ধমক দিয়ে উঠল—অ্যাও রামা!

রামতারণ চমকে উঠল। সে গালাগাল দিচ্ছিল বাবুকে।

—বেটা হারামজাদা আমাকে বলে, উল্লুক রাস্কেল! বেটা হারামজাদা, হারামীর বাচ্ছা!

নটবরের নেশা জ'মে এসেছিল, সে লাল চোখ বিস্ফারিত ক'রে ধমক দিলে—অ্যাও রামা, খবরদার!

—কেন?

—কেন কি? দোব তোমার দাঁত দু পাটি ভেঙে।

—দাঁত দু পাটি ভেঙে? কেন? শুনি?

—কেন? ভদ্রলোককে গাল দিচ্ছিস কেন? হারামী! হারামজাদা! বেইমান কোথাকার!

সে দাঁতের পাটির উপর দাঁতের পাটি রেখে—হাতের মুঠোয় ঘুষি পাকিয়ে উঠে দাঁড়াল। বললে—দোষ কার? তোর, না, মনিবের? বলুক পাঁচজনে।

পাঁচজনকে কিছু বলতে হ'ল না, রামতারণ উঠে দাঁড়াল, বললে—চললাম আমি।

জামার কলার চেপে ধরলে নটবর।—যাবি? যাবি কোথা? তোর চাকরি ক'রে দিয়েছি আমি। তোর মনিব আমাকে চেনে। তুই তার কাছে টাকা অ্যাডভান্স নিয়ে রেখেছিস। তুই চ'লে যাবি, আমি বাবুর কাছে মুখ দেখাব কি ক'রে? ফ্যাল্ টাকা, টাকা ফেলে তুই যেখানে যাবি যা।

নটবরের হাতের মুঠো ভাইসের মত চেপে ধরেছিল জামা। রামতারণ সবেগে ছুটল, জামার আধখানা থেকে গেল নটবরের হাতে, রামতারণ ছুটে বেরিয়ে গেল।

নটবর বললে—যা, কোথায় যাবি।

কোথায় যাবে এ কলকাতার শহরে? পকেটে পয়সা নেই, যাবে কোথায়?

কিন্তু গেল রামতারণ। সে ফিরে এসে আর নটবরের পায়ে গড়িয়ে পড়ল না, বললে না—মাফ কর নটবরদাদা, আমার দোষ হয়েছে।

* * * *

চার বছর পর হঠাৎ এল রামতারণ। সে রামতারণই নয়—এ অন্য এক রামতারণ।

একখানা নতুন দশ হর্স-পাওয়ারের গাড়ী চালিয়ে এল। পরনে স্যুট, মুখে সিগারেট, চোখে গগল্স্। ওনার-ড্রাইভার রামতারণ। আজব সহর কলকাতা, তাজ্জব নসীবের খেলা! অবাক হ'ল নটবর। রামতারণ বললে—নটবরদা!

—কে? প্রথমটা চিনতে ঠিক পারলে না নটবর।

—চিনতে পারছ না? আমি রামতারণ। চোখের গগল্স্টা খুলে ফেললে সে। হাসতে লাগল রামতারণ।

রামতারণ লটারীতে তিরিশ হাজার টাকা পেয়েছে।

—তোমার বাবুর অ্যাডভান্সের টাকাটা দিয়ে এলাম। এখন তোমার কাছে এসেছি। সেদিন আমার দোষ হয়েছিল, তুমি মাফ কর। আর—

হাসলে রামতারণ, বললে—আর মোটর মেরামতের একটা কারখানা

করেছি। নাম দিয়েছি ড্রাইভার অ্যাণ্ড কোম্পানি। তাতে তোমাকে আসতে হবে। কারখানার ম্যানেজার। সর্বেসর্বা হবে তুমি। দু শো টাকা মাইনে আর শেয়ার।

* * * *

ড্রাইভার অ্যাণ্ড কোম্পানি।

টিনের শেড, টিনের বেড়া, সামনে পেট্রোল পাম্প, র‍্যাম্প। ভিতরে ভাঙা গাড়ী মেরামত চলছে। হাতুড়ি, রেঞ্চ, স্ক্রু-ড্রাইভার, জ্যাক, রঙ-করা যন্ত্র নিয়ে কাজ চলছে। অচল গাড়ীর তলা থেকে বেরিয়ে রয়েছে জোড়া-জোড়া পা। বনেটের ভিতরে ঝুঁকে রয়েছে মাথা। দেখা যায় শুধু পিঠগুলো। শব্দ ওঠে বিচিত্র, গন্ধ ওঠে বিচিত্র—রঙের, পেট্রোলের, মোবিলের।

নটবর ঘুরে বেড়ায়। রামতারণ ব'সে থাকে চেয়ারে। পাথরের মত মুখ। আশ্চর্য! মনে তার তৃপ্তি নেই।

ইসমাইল হেড মেকানিক। সে মাঝে মাঝে বলে—কেয়া হুয়া?

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে রামতারণ বলে—দিক্ মৎ করো ইসমাইল। ওরে হুঁকো, চা নিয়ে আয় তিনটে—ইসমাইল, নটবরদা, আমি। ভাল ক'রে কাপ ধুয়ে আনবি।

হুঁকো, পটলা, গোপ্‌লা, খ্যাঁদা, প্রফুল্ল—এরা সব ছোকরার দল।

খাটছে। খট খটাং। খট খটাং।

ইঞ্জিনে রেস দিচ্ছে। গোঁ—গোঁ—গোঁ—

—ব্যাস, বন্ধ কর।

—নাও আবার স্টার্ট।

—বন্ধ কর।

—স্টার্ট।

—ঠিক হায়। ট্রাই দিয়ে এস। রামতারণ উঠে এসে রাস্তায় দাঁড়ায়। কিছুতে সুখ নাই, তৃপ্তি নাই।

—ইসমাইল!

ইসমাইল গিয়ে দাঁড়ায় রামতারণের সামনে।

—ব'স। চেয়ারে ব'স। কাল আসবে না বলেছ?

—না। তিন-চার দিন আসতে পারব না।

—তিন-চার দিন? ১৬।১৭।১৮।১৯শে? তা হ'লে কি ক'রে চলবে?

—কি করব, উপায় নাই। হাসে ইসমাইল।

১৬ই আগস্ট ১৯৪৬ সাল। কি ক'রে আসবে ইসমাইল?

উধর্বশ্বাসে মোটর ছুটিয়ে বেরিয়ে এসে বাঁচল রামতারণ। ধর্মতলার মোড়ে লরীর উপর ইসমাইলের মত কাকে ডাণ্ডা ঘুরিয়ে নাচতে দেখেছে সে। কি তার মূর্তি! আল্লা-হো-আকবর! না-রা-য়ে তকদীর! মুসলীম লীগের ক্ষিপ্ত শোভাযাত্রা। লাল আগুন জ্বেলে দিলে মুসলমানপ্রধান অঞ্চলগুলিতে।

তাদের অঞ্চলটাও তখন ধোঁয়াচ্ছিল। রাস্তা লোকে লোকারণ্য। লাঠি, ডাণ্ডা, দা, কাটারি—যে যা পেয়েছে তাই সংগ্রহ করেছে। উত্তর অঞ্চল থেকে আসছে না-কি মুসলমানদের শোভাযাত্রা। নটবর একটা প্রকাণ্ড দল তৈরি করেছে এরই মধ্যে। কোমরে ছোরা, হাতে লাঠি। নটবরের চোখ লাল, থমথম করছে তার মুখ। ছেলের দল হাঁকছে—বন্দে মাতরম্! জয় হিন্দ্!

রামতারণ লরিটা কারখানায় ঢুকিয়ে দিয়ে চুপ ক'রে বসল চেয়ারে।—পাগল হয়ে গেল সব! পাগল! হে ভগবান! রক্তারক্তির পালা পড়েছে। ভেসে যাবে সব রক্তের স্রোতে, ছাই হয়ে যাবে আগুনে পুড়ে। উত্তেজনায় হঠাৎ উঠে দাঁড়াল রামতারণ। বুকের ভিতরটায় ধকধক ক'রে কিছু যেন লাফিয়ে উঠল। বুকে হাত দিলে রামতারণ।

*   *   *

কলকাতা কালো হয়ে গেল। লাল আগুন নিবে অঙ্গার হ'ল। লাল রক্ত শুকিয়ে প'চে কালো রঙ ধরল। নোয়াখালি হ'ল, বিহার হ'ল। কলকাতায় দাঙ্গা থামে আবার লাগে। লাগে আবার থামে।

ড্রাইভার অ্যাণ্ড কোম্পানিও দাঙ্গার সঙ্গে বন্ধ হয়, দাঙ্গা থামে আবার চলে।

চলে আবার বন্ধ হয়। কারখানাটা—হিন্দু আর মুসলমান পাড়ার সীমান্ত-ভূমিতে। এদিকে হিন্দু, ওদিকে মুসলমান। কারখানাটা সেদিন বন্ধ।

বন্ধ থাকলেও ভিতরে তিন জন ছিল।—রামতারণ, নটবর আর ইসমাইল।

মদ খেয়ে ঝিমুচ্ছিল। তিন জনে পরস্পরের দিকে চেয়ে ব'সে ছিল নির্বাক হয়ে। রামতারণের বুকের ভিতরটা সেই ধকধক করছিল। সেই যে প্রথম দিন থেকে সুরু হয়েছে, সে কিছুতেই থামছে না।

ধক-ধক! ধক-ধক! ধক-ধক! সঙ্গে সঙ্গে একটা অসহনীয় উদ্বেগ। কিছু ভাল লাগে না। দুনিয়া তেতো হয়ে গেছে। রামতারণ মদ খেয়েও তৃপ্তি পায় না, ঘুম আসে না, কিছু করবার না-পেয়ে আয়না চিরুণী নিয়ে কেবলই চুল আঁচড়ায়, মুখ ঘষে। মনোহর ক'রে তুলতে চায় নিজেকে।

রাত্রি গভীর হয়ে আসে। ওদিক থেকে হাঁক ওঠে—আল্লা হো আকবর!

এদিক থেকে জবাব ওঠে—জয় হিন্দ্!

—না-রা-য়ে তকদীর!

—বন্দে মাতরম্!

এদিকের মুখে গিয়ে দাঁড়ায় ইসমাইল। ওদিকে গিয়ে দাঁড়ায় নটবর। মাঝখানে ব'সে থাকে রামতারণ। হাতের কাছে ডাণ্ডা, পাইপগান, ছোরা, বোমা। কোলের কাছে সামনে মদের বোতল। চোখ দুটো রাঙা, যেন ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে। মুখ তেতো, বুকের ভিতরটায় অসহনীয় উদ্বেগ। দেহে জ্বরের মত উত্তাপ। অন্তরের অন্তস্তল থেকে কি যেন ঠেলে উপরের দিকে উঠতে চাইছে। পাহাড়ের তলদেশের গলিত ধাতুর মত উপরের দিকে ঠেলে উঠছে।

শালা!—ইসমাইলটা পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে। ছোরাটা নিয়ে নাড়েচাড়ে রামতারণ। আবার ফেলে দিয়ে শিউরে ওঠে সঙ্গে সঙ্গে। আবার কিছুক্ষণ পরে শক্ত হয়ে বসে—শালা!

—হুয়া, কুছ হুযা! আভি ঠিক হো যায়গা! স্টার্ট করো। ঠিক হো গেয়া। চলা যাইয়ে মজাসে।

—শালা!

দাঁতের পাটির উপর দাঁতের পাটি শক্ত হয়ে বসল। চোয়ালের হাড় দুটো ঠেলে বেরিয়ে পড়ল। মুখ ফিরিয়ে নিলে সে। ওদিকে নটবর হেঁট হয়ে ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে দেখছে বাইরের অবস্থা।

লোহার ডাণ্ডাটাকে পা দিয়ে সরিয়ে দিলে রামতারণ। মানুষের মাথার ঘিলু আর রক্তের দাগ লেগে রয়েছে ডাণ্ডাটাতে। বাইরে যেন কে বলছে—শালা! অ্যাও.. দোব দু পাটি দাঁত ভেঙে!

আঃ, ছি-ছি-ছি! জামার আধখানা ছিঁড়ে গেল! অর্ধ-উলঙ্গ দেহ নিয়ে রাত্রের কলকাতার মধ্যে ছুটে চলে রামতারণ।

চীৎকার ক'রে উঠল রামতারণ—পশুর চীৎকারও এত বীভৎস কদর্য হয় না।

চোখের দৃষ্টিতে ও কি বেরিয়ে আসছে?

লোহার ডাণ্ডাটা তুলে মারে আয়নাটার উপর। শালা!

কি হ'ল রাম ভাই?—নটবর জিজ্ঞাসা করলে।

কেয়া হুয়া?—ফিরল ইসমাইল।

রামতারণ মদের বোতলটা মুখে তুলেছে তখন, উত্তর দেওয়ার সময় নেই।

জ্বলছে বুকটা। জ্ব'লে যাচ্ছে। নির্জলা মদ। আঃ, সেই বাবুটা—বাবুটা মরেছে। হার্টফেল ক'রে মরেছে।

—আর খাস নে, রাম ভাই। না না।

রাম আবার মুখে তোলে বোতল।

এবার কেড়ে নেয় বোতল। রাম চুপ ক'রে ব'সে ঝিমোয়। হঠাৎ কাঁদতে সুরু করে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে।

—রাম ভাই!

রাম কাঁদে।

—কি হ'ল রে? হ'ল কি? রাম! যাঃ গেল! বল্ না রে কি হ'ল!

হুয়া, কুছ হুয়া, জরুর হুয়া!—ইসমাইল হেসে বললে। সে জানে কি হয়েছে। ওদিক থেকে ফিরে এসে সে বসল। রামের মদের বোতল কেড়ে

নিয়েছে নটবর। রামের কলিজা কত বড়, দিল কত বড়? মদ না হ'লে বড় কলিজা বড় দিল ঠিক থাকবে কেন? মোটরের সেল্‌ফের তার খুলে গিয়েছে। ইলেকট্রিসিটি পৌঁছুচ্ছে না। ঠাণ্ডা হয়ে গেল ইঞ্জিন। জুড়ে দাও। মদের বোতল আবার রামের মুখে পুরে দাও।

স্থির রক্তাভ দৃষ্টিতে রাম তাকালে ইসমাইলের দিকে। চোখের কোণ থেকে চিবুক পর্যন্ত জলের ধারা চকচক করছে আলোর ছটায়।

ইসমাইল নটবরের হাত থেকে বোতলটা নিয়ে রামের দিকে এগিয়ে দিয়ে হেসে বললে—স্টার্ট করো।

রামতারণের চোখের জলের ধারা শুকিয়ে যাচ্ছে দেহের উত্তাপে। মুখখানার চেহারা পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে। বৈশাখী দুপুরে রেড রোডের উত্তাপ কারখানায় ছড়িয়ে পড়ছে।

করো স্টার্ট!—হেসে বোতলটা আরও এগিয়ে দিলে ইসমাইল।

কেড়ে নিয়ে বোতলটা মুখে ঢাললে রামতারণ।

—বাস, ঠিক হোগেয়া! চলো মজাসে।

সঙ্গে সঙ্গে চীৎকারে টিনের শেডটা গভীর রাত্রির অরণ্যের মত ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল।—আ—

রামা!—নটবর চীৎকার ক'রে উঠল।

রাম তাকিয়ে রয়েছে ইসমাইলের রক্তাক্ত দেহটার দিকে। হাতের ছোরাটা রক্তাক্ত। মুখ তুলে সে এবার নটবরের দিকে তাকালে—শালা! হারামজাদা! হারামী!

অ্যাও রামা! দোব তোর দু পাটী দাঁত ভেঙে।—দাঁত দু পাটী বেরিয়ে পড়ল রামতারণের।

—হারামজাদা? বেইমান কোথাকার?

লাফিয়ে উঠল রামতারণ—জামাটা আধখানা ছিঁড়ে গেল, রাত্রির কলকাতার পথে সে একা। মনের ক্ষোভ বুক ফাটিয়ে ফেটে পড়ল।

ছোরাটা ফেলে দিয়ে সে হাতের কাছের বোমাটা নিয়ে মেঝের উপর প্রচণ্ড আঘাত দিয়ে ঠুকল।

প্রচণ্ড বিস্ফোরণে ইলেকট্রিক আলো নিবে গেল। গভীর অন্ধকারে ছেয়ে গেল পথ। শুধু কারখানার ভিতরে লোহা-লক্কড়-টিনে প্রতিহত শব্দটা ঝনঝন ক'রে রেশ টেনে চলেছে।

ছিন্নবিচ্ছিন্ন নটবর কাতরাচ্ছে।

ছিন্নবিছিন্ন রামতারণ বিড়বিড় ক'রে কি বলছে। বিস্ফোরণের শব্দেব রেশের মধ্যে তা বোঝা যাচ্ছে না।

কালো মেয়ে

কালো মেয়ে। সংসারে অনেক কালো বস্তু আছে, কিন্তু তার কোনটির সঙ্গে উপমা দিলে তার কালো রঙের মাধুর্যকে ক্ষুণ্ণ করা হবে, তার মহিমার অমর্যাদা করা হবে। সে উপমা রাত্রি। কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী রাত্রির সঙ্গেই একমাত্র তার তুলনা দেওয়া যায়। ভিতরে বাহিরে মাধুর্য-মহিমায় সে ঠিক যেন কৃষ্ণাচতুর্দশী। সুডৌল কালো মুখে দুটি ডাগর শুভ্র চোখ—বৃহস্পতি এবং শুক্র গ্রহের শোভায় ঝলমল করে। কারও দিকে তাকায় না। আনত চোখে পথের উপর দৃষ্টি রেখে চ'লে যায়। পিঠের কাপড়ের সাদা জমির উপর প'ড়ে থাকে মোটা দীর্ঘ একটি বেণী: কোন কোন দিন বাঁধা থাকে এলো খোঁপা; কচিত কখনও এলো চুল প'ড়ে থাকে পিঠের উপর, গোটা পিঠ ছেয়েও ধরে না। নিচের দিকে জানু ছুঁয়ে থাকে। সেদিন মনে হয় কৃষ্ণা-চতুর্দশী-রাত্রে মধ্যাকাশ থেকে দিগন্ত পর্যন্ত ঘন কালো মেঘ সঞ্চারিত হয়েছে।

হাতে থাকে খান দুই খাতা—দু'একখানা বই, একটু লক্ষ্য ক'রে দেখলে চোখে পড়ে একটি পেন্সিলের উল্টো দিকটা।

কখনও কখনও মাটি থেকে চোখ তুলে তীর্যক এক-আধজনকে তাকিয়ে দেখে—সে কটাক্ষ দেখে বিভ্রম জাগে মনে। বুঝতে পারা যায় না—ওই ভ্রূভঙ্গির অন্তর্নিহিত ভাবটি সঠিক কি! কখনও মনে হয়, হয়তো আছে ভীরুতা, মনে মনে মেয়েটির শঙ্কার আর সীমা নাই, তার সঙ্গে নিজের কালো রঙের জন্য লজ্জাও আছে এক রাশি। কখনও মনে হয়, ওসব কিছুই নয়—মনে মনে ওর আর তিক্ততার সীমা নাই, পৃথিবীর সমস্ত কিছুর এবং সকল জনের উপর অপরিমেয় অবজ্ঞা তীর্যকদৃষ্টির শুভ্রতার মধ্য দিয়ে উঁকি মারছে।

ঘড়ির কাঁটার মত নিত্য ভোরে একবার যায়, ফেরে আটটায়; আবার যায় সাড়ে দশটায়, ফিরে আসে সাড়ে চারটে বিকেলবেলা। পায়ে একজোড়া পুরনো স্যাণ্ডেল তার গোড়ালির দিকটা এমন ক্ষ'য়ে পাতলা হয়ে গেছে যে,

গোড়ালির আধখানাই পড়ে মাটিতে। কোন কোন দিন দেখা যায় পা টেনে চলছে অর্থাৎ কোন একটা স্ট্র্যাপ ছিঁড়ে গেছে। আর কাপড় ব্লাউস সাদা ছাড়া মেয়েটি পরে না। পুরানো কিন্তু ধবধবে সাদা। কোন দিন ময়লা কাপড় পরতে কেউ দেখে নি মেয়েটিকে। পাতলা লম্বা গড়নের দেখতে একটু বেমানান লাগে। একটু খাটো মাথায় হ'লেই যেন ভাল হ'ত ; আর এত রোগা যদি না হ'ত এবং নিজের সম্বন্ধে এত সচেতন ও তীর্যক কটাক্ষের মধ্যে তিক্ততারই হোক আর শঙ্কারই হোক এমন কাঁটা যদি না থাকত। জনতা দেখলেই ঘাড় নুয়ে পড়ে মেয়েটির। জনতাকে অতিক্রম ক'রে ঘাড় বেঁকিয়ে ওই বিচিত্র কটাক্ষপাতে চকিতে দেখে নেয়—কার মুখে কি ভাব ফুটে উঠেছে! ব্যঙ্গহাস্য—করুণা, না কি? ও চকিতেই, মুহূর্তে ঘাড় ঘুরিয়ে নিয়ে মাটির বুকে চোখ রেখে চ'লে যায়। আর বারেকের জন্যও ফিরে তাকায় না। বড় রাস্তা থেকে একটা গলিতে ঢুকে পড়ে। গলিটা প্রবেশ-মুখে বেশ একটু প্রশস্ত। দু'পাশে কয়েকখানা পাকা দোতলা একতলা বাড়ী। দুখানা-তিনখানা বাড়ীর চেহারায় আধুনিকতার ছাপ আছে। অর্থাৎ গড়নের কায়দায়, জানলা-দরজার ফ্যাশনে, বাড়ী ঢোকবার দরজার সামনে এক টুকরো গোল কি ছয় বা আট কোণা ঝোলানো বারান্দায় বাহারে এবং দরজা জোড়াটার গায়ের বিবর্ণ পালিশে ও দরজার দু পাল্লার গায়ে লাগানো নিকেল করা হ্যাণ্ডেলে। চৌকাঠের বাজুর গায়ে ইলেকট্রিক বেলের সুইচও আছে। হয়তো বা বাজে, নয়তো বাজে না। এই তরফটা পার হয়েই রাস্তাটা হয়েছে সংকীর্ণ। এখান থেকে আরও খানিকটা গিয়ে গলিটা সত্যিই গলিরূপ ধারণ করেছে। তিন হাতটাক চওড়া হবে, কোথাও কোথাও হঠাৎ ম্যালিরিয়ায় জীর্ণদেহ মানুষের প্লীহাস্ফীত উদরের সঙ্গে উপমার অবিকল সঙ্গতি রেখে সাড়ে চার হাত কি চার হাত দাঁড়িয়ে গেছে। তারপর আবার তিন হাত—আড়াই হাত—দু হাত। দু পাশে ছোট ছোট বাড়ী, সামনেটা পাকা রঙচঙ করা, ভিতরটায় টিনের চাল, ইটের দেওয়াল, ছোট কুঠরী—নিম্ন-মধ্যবিত্তের বাড়ী। মস্ত একটি পাড়া। বস্তি বললে অধিবাসীরা চ'টে ক্ষুণ্ণ হয়। মূল গলিটা থেকে আবার দেড় হাত চওড়া গলি চ'লে গেছে

অনেকগুলি। সেই গলির একটি গলি ধ'রে চ'লে যায় কালো মেয়েটি। গলির দুপাশের বাড়ীর দোবে কি রোয়াকে যারা ব'সে থাকে তারা তাকে দেখে, কিন্তু কেউ কোন মন্তব্য করে না ; বরং সম্ভ্রমেই তারা মাথা নত করে যেন।

উপীনবাবু মাস্টারের মেয়ে—সুমতি।

দরজার কড়া নাড়ে সুমতি, ভিতর থেকে দরজা খুলে দেয় একটি ছোট ছেলে—সুমতির ছোট ভাই, শঙ্কিত ধূর্ত দৃষ্টি তার চোখে, পাকানো শরীর, রঙটা সুমতির মত কালো নয়—শ্যামবর্ণ বলা চলে। সুমতির চোখে চোখ রেখে বলে—দাদা এসেছিল।

বুকটা ধড়াস ক'রে ওঠে সুমতির।—দাদা ? ছোড়দা ?

ঘন ঘন ঘাড় নেড়ে শ্যামল—সুমতির ভাই জানায়—হ্যাঁ।

ফিস্ ফিস্ ক'রে সুমতি প্রশ্ন করে—বাবা জানেন ?

হ্যাঁ-এর ভঙ্গিতে ঘাড় উল্টে দিয়ে শ্যামল বললে—বাবার কাছেই তো এসেছিল।

হিম হয়ে গেল সুমতির হাত-পা। বাবার কাছে এসেছিল ? তা হ'লে বাবা—?

ঠিক এই মুহূর্তেই ঘরের ভেতর থেকে গলা ঝাড়ার শব্দ হ'ল। তার পরেই গম্ভীর কণ্ঠে ডাক এল—সুমতি !

উপীনবাবুর দুটি পা পঙ্গু হয়ে গেছে, দুরারোগ্য বাতব্যাধিতে ভুগছেন তিনি দীর্ঘদিন—আজ পাঁচ বৎসর।

সুমতি চকিত হয়ে সাড়া দিল—বাবা ! সে ত্বরিত পদক্ষেপেই গিয়ে ঘরে ঢুকে বাবার বিছানার পাশে দাঁড়াল।

দশ ফুট আট ফুট একখানি ঘর ; পুরনো একখানা ডবল বেড খাটে খাট-কেনার আমলের গদি এবং তার উপর বাড়ীর যত কিছু বিছানা—কাঁথা, লেপ, সতরঞ্চি পেতে পুরু ক'রে পাতা বিছানার উপর শুয়ে আছেন উপীনবাবু। পাঁচ বছরে পা দুটি অনেকটা শীর্ণ হয়ে এসেছে, কালো রঙ ধরেছে। পা দুখানা শুকিয়ে আসছে—দেখলেই বুঝতে পারা যায়। শান্ত উদার দৃষ্টির আবরণের নীচে ক্ষোভ-বেদনা থরথর ক'রে কাঁপছে—সুমতি দেখেই বুঝতে পারল।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে উপীনবাবু বললেন—অমল এসেছিল।

চুপ ক'রে রইল সুমতি। কি বলবে সে? বিস্ময় প্রকাশের ক্ষণও পার হয়ে গেছে। না জানার ভান করবার সামর্থ্যও তার ছিল না।

—আমাকে কুৎসিত ভাষায় তিরস্কার ক'রে গেল। বালিশের তলা থেকে চাবি বের ক'রে নিয়ে বাক্স খুলে তোর মায়ের বালা জোড়াটা বার ক'রে নিলে। চীৎকার করতে পারলাম না। লোক জড়ো হবে। শুধু একবার বললাম—অমল, সুমতির বিয়ের সময় ওই দিয়ে আশীর্বাদ করবার জন্তে বার বার ব'লে গেছে। ও দুটো তুমি নিয়ো না। সে শুনলে না।

চোখ ফেটে এবার তাঁর জল বেরিয়ে এল। গড়িয়ে পড়ল শীর্ণ গাল দুটি বেয়ে কানের পাশ দিয়ে বালিশের উপর।

সুমতি মাথার গোড়া থেকে ছেঁড়া তোয়ালেটা নিয়ে বাপের চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে বললে—আপনি কাঁদবেন না বাবা। আমার তো কোন কালেই দরকার হবে না ওর। সে নিয়ে গেছে যাক।

কৃষ্ণাঙ্গী শ্রীহীনা মেয়েটির দিকে তাকিয়ে আবার একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন উপীনবাবু।

সুমতি বললে—আমি চা ক'রে আনি বাবা।

উপীনবাবু আবার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। মনে মনে বললেন—হায় রে ভাগ্য!

ভাগ্যই বটে!

উপীনবাবু জীবনে অনেক আশা করেছিলেন। তিনি নিজে ছিলেন ইস্কুলের শিক্ষক। শিক্ষক হিসেবে তাঁর নাম ছিল। অনেক ভাল ছাত্র তাঁর হাত দিয়ে তৈরী হয়েছে। উপার্জন নেহাত মন্দ করেন নি। অন্তত তাঁর নিজের ধারণা-তাই। কারণ জীবনধারণের মান সম্পর্কে তার আদর্শবাদ ছিল সেকালের। দারিদ্র্যকে তিনি বলতেন—পরীক্ষা। দারিদ্র্যকে জয় ক'রেই তো প্রতিষ্ঠা আসে। দারিদ্র্যই তো তৈরী করে সেই দুর্লভ মানুষ, যে সম্পদের প্রতিষ্ঠাকেও লঙ্ঘন ক'রে আরও উঁচুতে ওঠে চরিত্রবলে। সেই

আদর্শেই তিনি চিরজীবন টুইলের শার্ট, মিলের ধুতি, ক্যাম্বিসের জুতো প'রে কর্মজীবনটা কাটিয়ে দিয়েছেন। আশা ছিল তাঁর অনেক। বড় ছেলে বিমল বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র। সমস্ত জীবন ঢেলে তিনি বিমলকে তৈরী করেছিলেন। জীবনে যত উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাঁর প্রচ্ছন্ন ছিল, যা তিনি সমস্ত পৃথিবীর কাছ থেকে সযত্নে লুকিয়ে রেখেছিলেন, তার সবটা তিনি দিয়েছিলেন বিমলকে। বিমলকে তিনি পডাতেন আর মধ্যে মধ্যে এক একদিন আবেগের মাথায় ঘরে পায়চারি করিতে করিতে বলতেন—দৃষ্টি রাখবে সামনে—দূর দুর্গম পাহাড়ের চূড়ার উপর। পিছনে তাকাবে না—আশে না, পাশে না; সামনে দৃষ্টি রেখে শক্ত পায়ে এগিয়ে যাও। উঠতে হবে ওই চূড়ার উপর।

বিমল এম. এ.তে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়েছিল। চাকরিও এখানে পেয়েছিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সে পেয়েছিল বিদেশ যাবার বৃত্তি। বিমল বৃত্তি পাবে না ভেবেই দরখাস্ত করেছিল; কিন্তু যখন পেয়ে গেল তখন সে যেতে চায় নি। বলেছিল—না, আপনি আর খাটবেন কত?

উপীনবাবু সেই পুরনো কথা বলেছিলেন—পাহাড়ের চূড়ায় তোমাকে চডতে হবে। পিছনে তাকিও না। এগিয়ে যাও।

বিমল এগিয়ে গেল। সে এগিয়ে যাওয়া তার থামে নি। পাহাড়ের চূড়াতেই সে উঠেছে। অবশ্য ছোট একটা পাহাডের চূড়া। সে চূড়া থেকে অন্য চূড়ায় অভিযানের কোন সংবাদ পান নি উপীনবাবু। কিন্তু সে চূড়া থেকে আর নামে নি বিমল। সে সেই বিদেশেই এক সহপাঠিনীকে বিবাহ ক'রে সেখানেই চাকরি নিয়ে থেকে গেছে। বিজ্ঞানের ছাত্র ছিল সে; বিজ্ঞানসমৃদ্ধ বিদেশে তার মত কৃতী ছাত্রের অনাদর হয় নি। বিমল লিখেছিল—যা শিখলাম, তা কাজে লাগবার সুযোগ ওদেশে হবে না। সুতরাং দেশে গিয়ে সমস্ত জীবনটাকেই ব্যর্থ করা আমি যুক্তিযুক্ত মনে করি না।

এর উত্তর হয়তো ছিল; হয়তো কেন—নিশ্চয় ছিল। কিন্তু সে উত্তর উপীনবাবু দেন নি। ছেলে তখনও বিয়ের সংবাদ দেয় নি। তবু তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। বিমলকে পাঠাবার সময় এই দিকটা তিনি আদৌ ভাবেন নি।

তাঁর ছেলে ওখানে বিয়ে ক'রে বসবে, বিমলের মত ছেলে—এটা তিনি ভাবেন নি।

তাঁর স্ত্রী কেঁদেছিল—তিনি হেসেছিলেন।

১৯৪৬ সালে বিমল বিদেশ গেছে ; ১৯৫১ সালে খবর এল।

বিমল আর চিঠিও দেয় না নিয়মিত। কালে কস্মিনে এক-আধখানা চিঠি আসে।

মেজ ছেলে অমল—সুমতির ছোড়দা, আজ যে এসেছিল। লেখা-ডায় সেও খুব খারাপ ছিল না। ফার্স্ট ডিভিশনে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করেছিল। তার যে কি হ'ল, কেমন ক'রে কোন্ দিক দিয়ে কোন্ ধাক্কায় আজকের অবস্থায় এসে পৌঁছল—সে উপীনবাবু বুঝতেই পারেন না।

৪৬ সালে প্রথম সে জেলে গেল। কি একটা উপলক্ষে। সে দিন উপীন-বাবু অহঙ্কার অনুভব করেছিলেন। এই দিক দিয়ে তাঁর জীবনের একটা দেনা ছিল। একটা অভাব ছিল জীবনে। দেশের স্বাধীনতা-আন্দোলনে তিনি তাঁর জীবনে কোন সক্রিয় সাহায্য করতে পারেন নি। শুধু চাকরির জন্যেই পারেন নি—এটা ঠিক নয়, সাহসের তাঁর অভাব ছিল। অমল সেটা পূর্ণ করলে, শোধ করলে দেনা—এই কথাই তিনি প্রথম দিন ভেবেছিলেন। অল্পদিন পরেই অমল অবশ্য খালাস পেল, কিন্তু সে অমল আর এক অমল। হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গায় অমলের আমূল পরিবর্তন হয়ে গেল।

দাঙ্গা থামল—অমল থামল না। আই. এ. ফেল ক'রে আবার পরীক্ষার জন্য তৈরী হতে হতে হঠাৎ পড়া ছেড়ে দিল।

উপীনবাবু তখন বিছানায় পড়েছেন।

অমল মেতে উঠল রাজনৈতিক দলের নাট্য-সমিতি নিয়ে, এবং সেখানেই নাকি দিলে প্রতিভার পরিচয়। সেই প্রতিভার সমাদর তাকে ঠেলে নিয়ে গেল ফিল্ম-স্টুডিয়োতে।

সেখানে অমল হয়ে গেল আবার এক নতুন অমল। নেশায় আসক্ত হয়েছে সে। থাকে এক ফিল্ম-অভিনেত্রীর সঙ্গে। বিবাহের চেয়ে বড় বলে যে জীবন—সেই জীবন যাপন করে। ইদানীং অমলের নামডাক ক'মে গেছে।

অভিনেত্রীটির নামডাক কোনকালেই এমন কিছু ছিল না। এখন একেবারেই নেই। অভাবের তাড়নায় আজ এসেছিল অমল—তার মায়ের গহনার ভাগ তার চাই।

উপীনবাবুর সঞ্চয় কিছু ছিল। তা তিনি বিমলকে দিয়েছিলেন বিদেশ-যাত্রার সময়। তারপর অসুখে পড়লেন। ইস্কুলের প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডে তখনও কিছু ছিল। সেটা গেল চিকিৎসায়। এখন তিনি আপসোস করেন, কেন যে তিনি চিকিৎসায় মিছে টাকাগুলি খরচ করেছেন! শুধু প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের টাকা নয়, স্ত্রীর গায়ের গহনাগুলিও গেছে এতেই।

সুমতির কথা তিনি বড় একটা ভাবেন নি ওর জন্মকাল থেকেই।

উপীনবাবুর নিজের রঙ কালো। তা ব'লে সুমতির মত এত কালো নয়। সুমতির মায়ের রঙ ছিল ফরসা। বিমলের রঙ ছিল মা-বাপ দুজনের রঙ মিলিয়ে একটা রঙ। অমলের রঙ মায়ের মত—সে গৌরবর্ণ, দেখতেও সুপুরুষ। সুমতি রাত্রির মত কালো রঙ নিয়ে জন্মাল। ওকে গড়বার সময় বিধাতা নামক যে দেবতাটির নাম শোনা যায়—তিনি বোধ করি নিষ্ঠুর কৌতুকরসে ডগমগ হয়ে উঠেছিলেন কোন কারণে। তাই অমাবস্যার রঙের পাত্রটি থেকে তুলি তুলে নিলেন এবং গড়লেন ওকে মেয়ে ক'রে। বিধাতা নামক দেবতাটির অস্তিত্ব প্রমাণ করতেই মেয়েটার জন্ম। শুধু তাই নয়—উপীনবাবুর কোন ছেলের বুদ্ধি মোটা নয়, সুমতির বুদ্ধিই মোটা—ভোঁতা।

প্রথম প্রথম উপীনবাবু মনে কল্পনা করতেন—মেয়েটিকে প্রাণ ঢেলে পড়িয়ে ওর জীবনে ওকে আমি দাঁড় করিয়ে দেব। অন্তত ইস্কুল-মাস্টারি ক'রেও খেতে পারবে।

কিন্তু আশ্চর্য! উপীনবাবু কোন মতেই মেয়েটার মাথার ঘরের দরজা খুলতে পারলেন না। মনে হ'ল, দরজাই নেই, একেবারে অন্ধের পৃথিবীর মত ওর মস্তিষ্কটা, অথবা নিরেট একটা কিছু। শুধু বোকা নয়, বোবার মত হাঁ ক'রে ব'সে থাকত, কথার উত্তর দিত না। সব থেকে আশ্চর্যের কথা তিরস্কারেও ক্ষুব্ধ হ'ত না। অপলক স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকত।

এ মেয়েকে বুঝতে পারতেন না উপীনবাবু। উপীনবাবু শেষ পর্যন্ত চেষ্টা ছেড়ে দিয়েছিলেন। ভেবেছিলেন, বিমল থেকেই ওর একটা ব্যবস্থা হবে। বিমল যে একটা বড় চাকরি পাবে তাতে তাঁর সন্দেহ ছিল না। অমল সম্পর্কেও তাঁর আশা তো কম ছিল না। ভেবেছিলেন, দুই ছেলে চাকরি করবে, তা থেকে একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের চরিত্রবান মাঝারি ছেলে দেখে তার হাতে ওকে তুলে দেবেন। চাকরিটা বিমলের অধীনে ক'রে দেবেন, তাতেই এই বোকার সামিল কালো মেয়েটার জীবন সহনীয় এবং নিরাপদ হবে। এ ছাড়া আর ভাবেন নি কিছু তিনি। অবজ্ঞা এবং অবহেলাই করেছিলেন তিনি। মধ্যে মধ্যে দায়ী করিতেন নিজেকে। বিমল এবং অমলের পর বছর পাঁচেক কোন সন্তান-সন্ততি তাঁদের হয় নি। তারপর এই কালো মেয়েটি।

বিমল ওকে স্নেহ করত। এই স্থূলবুদ্ধি কালো বোনটি ছিল তার কাছে পোষা আদরের বেড়ালের মত। ঘুরঘুর করত তার চারপাশে। বিমলের বই টেনে নিয়ে ছবি দেখত। বিমল ওকে পড়াবার চেষ্টা করত। অমল মারত। কালো মেয়েটা বোবা হয়ে তাদের দিকে তাকিয়ে থাকত।

উপীনবাবু ইস্কুলে ওকে দিয়েছিলেন। কিন্তু ইস্কুলে ওর পড়া হ'ল না। ক্লাসে বার বার ফেল করায় এই শিক্ষাজীবীর পরিবারটির সকল জনেই লজ্জা পেলেন, এমন একটা বিদ্যাগৌরবে গৌরবান্বিত বাড়ীর উজ্জ্বল মার্জিত গৌর মুখে কালো মেয়েটি কালি দিলে ব'লেই মনে হ'ল সকলের—মায় মায়ের পর্যন্ত। এবং মেয়েটিকে সিক্সথ ক্লাস থেকেই পড়া ছাড়িয়ে ঘরের কাজে নিয়োজিত করলেন। তারই সঙ্গে যতটুকু পড়া হয় হোক, আপন মনে যা ভাল লাগে পড়ুক। বাড়ীতে বইয়ের খুব অভাব ছিল না। বিমল পরখ ক'রে দেখেছিল সুমতি আর কি পারে? গান? নাচ? ছবি? কিন্তু কোনটাতেই তার কোন দক্ষতার লক্ষণ দেখা যায় নি। পায়ের গতি অস্বচ্ছন্দ, কণ্ঠস্বর কর্কশ না হ'লেও মধুর নয়, তার উপর আড়ষ্ট, ছবির রেখার টান মোটা।

উপীনবাবুর অদৃষ্ট। সেই মেয়ের হাতেই তাঁকে পড়তে হ'ল অসহায় শিশুর মত।

বিমল বিলেত গেল। মাস কয়েক পব অমল জেলে গেল। জেল থেকে ফিরল আব এক চেহারা নিয়ে। উপীনবাবু বাতে শয্যাশায়ী হলেন। একা গৃহিণী অসহায দৃষ্টি মেলে তাঁর বিছানার পাশে এসে সেদিন দাঁড়িয়েছিলেন—র‍্যাশন আনবাব দিন দু'দিন আগে পার হয়ে গেছে; দু'দিন উপীনবাবু বিছানা থেকে উঠতে পারেন নি—দু'দিন বাজার হয় নি; বাড়ীতে কিছু নেই। কি হবে?

কালো বোকা মেয়েটি এসে কাছে দাঁড়িয়েছিল—আমি যাব মা?

—তুই? তা হ'লে আমাব আর ভাবনা ছিল কি বল্?

আমি পাবব বাবা।—সে বাপের দিকে তাকিয়েছিল।

উপীনবাবু তার দৃষ্টির মধ্যে কোন বুদ্ধির দীপ্তির আকস্মিক স্ফুরণ দেখতে পান নি—দেখতে পেয়েছিলেন একটি গভীর আকুলতার আবেগ। ব্যঞ্জনাহীন বোকা বোকা চোখ দুটি তার ছলছল কবছিল সেদিন। উপীনবাবু সস্নেহে তার মাথায় হাত রেখে বলেছিলেন, পারবি? হ্যাঁ, পারবি। দাও, সুমতিকেই দাও। ও পারবে, ওর সঙ্গে খোকাকে পাঠিয়ে দাও।

খোকা শ্যামল; তখন তার বয়স বছর আষ্টেক। সুমতির বয়স এগার। আশ্চর্য সেই প্রথম দিন থেকেই মেয়েটি কাজে আজ পর্যন্ত ভুল করলে না। প্রতিটি কাজ প্রতিটি হিসেব সুমতি নিখুঁতভাবে ক'রে আসছে। তারপর বছর দুয়েক আগে সুমতির মা মারা গেলেন। সুমতিই সব করলে—প্রতিবেশীদের ডেকে তাদের সাহায্যে গাড়ী ডেকে উপীনবাবুর সঙ্গে খোকাকে নিয়ে শ্মশানে গেল। অমলকে পাওয়া যায় নি। সে গিয়েছিল বম্বে না কোথায়! খোকাকে দিয়ে মুখাগ্নি করাল, শ্রাদ্ধের আয়োজন করল, পুরুত ডাকল—সবই সে-ই করল। প্রতিবেশীরা সাহায্য অবশ্য করেছিলেন। কিন্তু সমস্ত কিছুর কেন্দ্রে ছিল সে-ই। মায়ের মৃত্যুর পর একদিন এসে বললে—বাবা, আমায় যদি একটু দেখিয়ে দেন তবে আমি পড়ি।

—পড়বি?

—হ্যাঁ বাবা। পারব আমি।

পারুক বা না পারুক, চেষ্টার তার ত্রুটি ছিল না। আজ ছ মাস হ'ল ইস্কুলে ভর্তি হয়েছে। ছ মাস আগে বলেছিল—বাবা, আমাকে ইস্কুলে ভর্তি ক'রে দিন না!

ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন উপীনবাবু। কিন্তু সে ক্রোধ তিনি প্রকাশ করবার আগেই সুমতি বলেছিল—বিদ্যাপীঠের হেডমিস্ট্রেস ছেলেবেলায় আপনার কাছে পড়েছিলেন; প্রাইভেট পড়াতেন আপনি। তিনি আমাকে বললেন—তুমি উপীনবাবুর মেয়ে! তিনি কেমন আছেন? আমি সব বললাম। তিনি বললেন—তুমি এস আমার ইস্কুলে, তোমাকে ভর্তি ক'রে নেব আমি। তোমাকে তো লেখাপড়া শিখতেই হবে। নইলে মাস্টার মশায়ের হবে কি? ছোট ভাইকে মানুষ করবে কি ক'রে? তোমার বাবাকে ব'লো—আমার নাম মলিনা সেন। তোমার বাবাই আমার নাম দিয়েছিলেন মলিনা। আমার নাম ছিল মিলি। অন্য নাম হয় নি। মাস্টার মশাই প্রথম দিন এসে বলেছিলেন—মিলি কি? মিলির মানে কি? তোমার নাম দিলাম মলিনা। রঙ তোমার ময়লা। তুমি মলিনা। ম্যাট্রিক দেবার সময় মিলির বদলে ফর্মে লিখলাম—মলিনা, সেই থেকে মলিনা হয়ে গেলাম। ব'লো মাস্টার মশাইকে।

মিলি সেন! মুখরা চপলা শ্যামলা রঙের মেয়ে, বাপ ছিলেন ইনসিওরেন্স কোম্পানির ম্যানেজার। মনে পড়েছে। ফার্স্ট ডিভিশনে ম্যাট্রিক পাস করেছিল মিলি।

মনের রাগটা তাঁর নিবে গেল। মিলি তাঁকে মনে রেখেছে? তাঁর প্রশংসা করেছে? তাঁর মেয়ে ব'লে সমাদর ক'রে নিতে চেয়েছে সুমতিকে?

সুমতি আবার বললে—কি বলব তাঁকে?

—হ্যাঁ, পড়বি। পড়াব বই কি। ইস্কুলে না পড়লে পড়ার ঠিক চাড় হয় না। বলতে বলতেই হঠাৎ তাঁর একটা কথা মনে হ'ল। তিনি জ্রকুঞ্চিত ক'রে জিজ্ঞাসা ক'রলেন—মিলির সঙ্গে তোর দেখা হ'ল কোথায়? তার কাছে কি জন্যে গিয়েছিলি?

একটু চুপ ক'রে রইল কালো মেয়েটি। তারপর বললে—ওঁদের ইস্কুলের কাছে সরকারী ডেয়ারীর দোকান খুলছে। সেখানে ইস্কুল-কলেজের মেয়েদের নেবে। সকালে দু ঘণ্টা ক'রে কাজ। হিসেব রাখা, কুপন হিসেব ক'রে নিয়ে হিসেবমত দুধ দেওয়া। পঁয়তাল্লিশ টাকা মাইনে। তাই আমি গিয়েছিলাম ওঁর কাছে।

উপীনবাবু নির্বাক হয়ে গেলেন। মনে হ'ল, পা দুটো তো অনেক দিনই পঙ্গু হয়ে গেছে, আজ মস্তিষ্কটাও পঙ্গু হয়ে গেল। চোখ দিয়ে শুধু জল গড়াতে লাগল অনর্গল ধারে।

তাঁর চোখ মুছিয়ে দিয়ে কালো মেয়েটি বললে—কাঁদবেন না বাবা। শ্যামল উঁকি মেরে দেখছে। ও-ও কাঁদতে শুরু করবে।

ভগবানকে ধন্যবাদ দিলেন উপীনবাবু।

সুমতিকে এমন কালো ক'রে পাঠিয়েছিলেন ভগবান—শুধু তারই জন্যে —শুধু তারই জন্যে। নইলে আজ কি হ'ত তাঁর?

সেই কাজ করতে ভোরবেলা একবার যায়, আটটায় ফেরে সুমতি। আবার দশটায় গিয়ে ফিরে আসে সাড়ে চারটে-পাঁচটায়।

ভোরবেলা বের হবার আগেই সে স্নান ক'রে উনুন জেলে চা ক'রে বাপকে খাইয়ে যায়; জলখাবার রেখে যায় দু টুকরো পাউরুটি, একটু মাখন, একটু চিনি। ভায়ের জন্যে রাত্রের তৈরী রুটি এবং গুড়। মাসে আট টাকা মাইনের ঠিকে ঝি রেখেছে একজন—দাসী তার নাম। সে এসে বাসন কখানা মেজে, রান্নাশালা ধুয়ে, উনুনে কয়লা চাপিয়ে রেখে চ'লে যায়। সুমতি এইভাবে দৃষ্টিকণ্টকিত সারাটা পথ অতিক্রম ক'রে এসে বাড়ীর দোরে একবার থমকে দাঁড়ায়—তারপব পিছন ফিরে তাকায়। ভুরু দুটি কুঁচকে ওঠে, দৃষ্টি তীব্র হয়ে ওঠে এতক্ষণে। সে রাস্তার দিকে তাকিয়ে দেখে। এখনও পর্যন্ত কি কেউ তাকে দেখছে? তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে কড়া নাড়ে। ওই দু ঘণ্টার মধ্যে রান্না ক'রে বাবাকে এবং ভাইকে খাইয়ে নিজে খেয়ে আবার বের হয়—ইস্কুলে যায়। সব দিন স্নান করে না, মেয়েটি কালো

ব'লেই বোধ করি কালো চুল তাব এক রাশি—রাশি বললে ঠিক হয় না, এক বোঝা। পিঠ ছাপিয়ে পাশে এসে প'ড়ে ওদিকে যায় হাঁটুর কাছাকাছি। এলো খোঁপা বাঁধলে একটা তালের মত প্রকাণ্ড হয়ে ওঠে। সাধারণত ও বেণীই বাঁধে সেই জন্যে।

মহানগরীর পথ—এখানকাব পথে লুব্ধকের অভাব নেই। শ্যেন দৃষ্টি প্রসারিত ক'রে তারা দাঁড়িয়ে থাকে, ঘুরে বেড়ায়। কালো মেয়ের প্রতিও তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হতে দ্বিধা কবে না। কিন্তু নতদৃষ্টি মেয়েটির গতি তাতে ব্যাহত হয় না, ওর সর্বাঙ্গ জড়িয়ে যেন একটা বর্ম আছে তাতেই প্রতিহত হয়ে ব্যর্থ হয় দৃষ্টির শরসন্ধান, দৃষ্টির তীরের মাথায় ইঙ্গিতের যে সূক্ষ্মাগ্র ফলাটি থাকে সেটা যেন ঠোকর খেয়ে ভোঁতা হয়ে ধুলোয় লুটিয়ে পড়ে। কিন্তু তাতেও তারা দমে না। দৃষ্টির শর ব্যর্থ হ'লে তারা শব্দের শর নিক্ষেপ করে। ঠোঁটের ভিতর আঙুল পুরে সিটি মারে। গান গেয়ে ওঠে। কেউ কেউ পায়ে পায়ে আগে-পিছু হাঁটতে শুরু করে, খানিকটা এসে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে ব্যর্থ হয়ে ফিবে যায়। কেউ বা পাশ দিয়ে যাবার সময় কিছু ব'লে যায়। এক-একজন মাঝে মাঝে একেবারে তাদের বাড়ীর গলির মুখ পর্যন্ত এসে থেমে যায়। গলির মুখে বড় রাস্তাটার উপরেই একটা পান-সিগারেটের দোকান আছে, সেই দোকানে পান বা বিড়ি-সিগারেট কেনবার অছিলায় দাঁড়িয়ে থাকে ততক্ষণ, যতক্ষণ পর্যন্ত তাকে দেখা যায়; তারপর বোধ হয় চ'লে যায়।

মধ্যে কয়েকদিন এক মোটরওয়ালা ছোকরা তাকে বিব্রত করেছিল। বিকেলবেলা বাড়ী ফেরবার পথে তার সঙ্গে দেখা হ'ত। কোনদিন গাড়ীখানা দাঁড়িয়ে থাকত ফুটপাত ঘেঁষে—সে স্টিয়ারিংয়ের উপর মাথা রেখে অলসভাবে সিগারেট টানত; কোন দিন ফুটপাথে পায়চারি করত; মেয়েদের মত বব-করা চুল, খাপচানো নাক, বাটারফ্লাই গোঁফ, পরণে ঢিলে পাজামা, গায়ে রঙীন শার্ট, পায়ে চকচকে জুতো, সিগারেট টানত। সুমতির চোখে মানুষ বড় পড়ে না। সে দেখে না কাউকে তাকিয়ে। এ লোকটিকে দেখেছিল, দেখতে বাধ্য হয়েছিল। একদিন হঠাৎ সামনে

পড়ার ভান ক'রে লোকটি তার পথ রুখে দাঁড়িয়েছিল। সুমতিকে থমকে দাঁড়াতে হয়েছিল এবং তার সেই ছেলেবেলার শুষ্ক দৃষ্টিতে সে তার আপাদমস্তক তাকিয়ে দেখেছিল। তার সে দৃষ্টিতে ভয় পেয়ে সঙ্গে সঙ্গেই পথ ছেড়ে সে ব্যস্ত হয়ে ওদিকের ফুটপাথের দিকে তাকিয়ে হাত তুলে—'নরেন, নরেন' ব'লে বার দুই কোন কাল্পনিক নরেনকে ডেকেই তাড়াতাড়ি গাড়ীতে চ'ড়ে গাড়ীটা চালিয়ে পালিয়েছিল।

ডেয়ারীর দুধ বিক্রির দোকানে আরও তিনটি মেয়ে কাজ করে। তারা সুমতির থেকে বয়সে বড়। তারা পড়ে না। তারা এ চাকরিটা ছাড়াও অন্য চাকরি করে। শুনেছিল সুমতি যে, এ কাজ পড়াশোনা যারা করে, অবস্থা খারাপ—এমন মেয়েদেরই দেওয়া হবে। কিন্তু কাজ করতে এসে দেখলে, তেমন মেয়ে সে একা। ঠিক তা নয়। প্রথম দিকে পড়ুয়া মেয়ে আর দুজন ছিল, কিন্তু তারা কিছুদিন পরেই কাজ ছেড়ে দিয়েছে। তাদের জায়গায় এরাই এসেছে।

তারা গল্প করে হাসে। তাদের মধ্যে নিরুপমা, সে একটা রেস্টুরেণ্টে কাজ করে; ডিউটি তার তিনটে থেকে আটটা। ফেরবার পথের বিচিত্র অভিজ্ঞতার গল্প করে। মধ্যে মধ্যে হাসে। কমলা ব'লে মেয়েটির একটি ছেলে আছে। দেখতে ছোটখাট, বেণী ঝুলিয়ে আসে, দেখে মনে হয় কুমারী মেয়ে। সে বিধবা। তার গল্প, শুধু এককালে তার কত অবস্থা ভাল ছিল তারই। মীরা গুহ, তার চোখে চশমা, শ্যামবর্ণ রঙ; কিন্তু সুশ্রী মেয়ে। সে গল্প করে সিনেমা-স্টুডিয়োর। সিনেমা-স্টুডিয়োতে সে যায় আসে, সিনেমায় নামবে সে। ডিরেক্টর অভিনেতা অভিনেত্রীদের নাম আর তাদের কথা।

ওরই মধ্যে নিঃশব্দেই প্রায় কাজ ক'রে যায় সুমতি।

মধ্যে মধ্যে মীরা বলে—তুমি কি রকম সুমতি?

—কেন?

—না। এই রকম ভাবে তাকিয়ে কথা ব'লো না তুমি। এ রকম তাকালে ভয় করে।

হাসতে চেষ্টা করে সুমতি।

—হাসই না একটু মন খুলে।

নিরুপমা বলে—আমার সঙ্গে একদিন আসবে তুমি সুমতি! দেখো তোমার মুখে হাসি ফুটিয়ে দেব।

নীরবে ঠিক সেই দৃষ্টি মেলে চেয়ে থাকে সুমতি।

নিরুপমা ভয় পায় না, ভয় পাবার মেয়ে সে নয়, অনেক ভয় এবং ভয়ঙ্কর সে দেখেছে। বলে—এস না একদিন সন্ধ্যের পর আমার রেস্টুরেণ্টে।

এরই মধ্যে খদ্দের এসে দাঁড়ায়। খালি বোতল এবং খান কয়েক কুপন টেবিলের উপর রেখে বলে,—নং শ্যামবাজার স্ট্রীট।

সুমতি হেঁট হয়ে ভর্তি দুধের বোতল বের ক'রে টেবিলে নামিয়ে দেয়।

—বাড়ীতে কিন্তু কম্প্লেন করছে—দুধ মাপে কম হচ্ছে।

নিরুপমা বলে—কি করব বলুন আমরা! সীল-করা বোতল। সেখান থেকে মেপে সীল ক'রে পাঠায়।

মীরা বলে—আপনারা রিটন্ কম্প্লেন করুন—আমরা পাঠিয়ে দেব।

সুমতি বলে—পাউণ্ডের মাপ আর সেরের মাপে একটু তো তফাত হবেই। এ তো পাউণ্ডের মাপ!

খরিদ্দার এ সব কৈফিয়তে খুশি হয় না। বিরক্ত হয়েই চ'লে যায়।

নিরুপমা হেসে বলে—যা হোক, ভদ্দরলোকের কল্যাণে সুমতি আজ কথা বলেছে।

সুমতি মুহূর্তের জন্য চমকে ওঠে। তার পরই তার সেই স্বভাবসিদ্ধ নিষ্পলক দৃষ্টিতে ওদের দিকে তাকিয়ে থাকে। কি বলে ওর দৃষ্টি, সে কেউ বুঝতে পারে না। সুমতি নিজেও পারে না।

কমলা বললে—তখন নিরুপমা মীরা চ'লে গেছে, ওদের দুজনের খুব ভাব। যাবার সময় নিত্যই প্রায় একসঙ্গেই দুজনে যায়।

কমলা বললে—তুমি এমন ক'রে তাকিয়ে থাক কেন সুমতি?

সুমতি প্রশ্ন করলে—কেমন ক'রে?

কেমন ক'রে?—হাসল কমলা।—যেমন ক'রে তাকাও সেইভাবে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে তাকালে বুঝতে পারবে।

হঠাৎ; না হঠাৎ নয়—ধীরে ধীরেই হয়তো বটে—কি যেন হ'ল সুমতির। জীবন যেন উদ্বেগকাতর হয়ে উঠল। কারণে অকারণে সে অন্তরে অন্তরে অধীর হয়ে উঠল।

ম্যাট্রিক পরীক্ষা তার সামনে। পড়াব সময় নেই, কাজকর্মের অবসরে যেটুকু সময় রাত্রে, তার মধ্যেও সে অপরিসীম ক্লান্তি অনুভব করে। পড়তে গিয়ে অবশ মনে ব'সে থাকে। কি হয়, কি ভাবে, বুঝতে পারে না। কখনও কখনও কান্না আসে। নীরবে নির্জনে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে।

উপীনবাবু সেদিন ভোরবেলাতেই ওকে ডাকলেন।

সুমতি স্নান সেরে ভিজে চুলের রাশি পিঠে এলিয়ে রুটিতে মাখন চিনি মাখাচ্ছিল। মাখনটা জোটে ওই ডেয়ারীতে চাকরির কল্যাণে। ওখানে চাকরি করে ব'লে সস্তায় পায়। সামান্য কিছু এমনিও পায়। সে বন্দোবস্ত করে নিরুপমা। মাখন, চীজ, ক্রীম—এসব নষ্ট হয়ে যাওয়ার একটা খাত আছে। সেই 'খাতে'র হিসেবটা খাতায় নিপুণভাবে নিরুপমা কষতে পারে।

উপীনবাবু ডাকলেন—সুমতি!

সুমতি তাঁর দিকে ফিরে তাকাল।

—এখানে আয়, শোন্।

রুটির পাত্রটা হাতে নিয়েই সে এসে বাবার কাছে দাঁড়াল।

—শ্যামল বলছিল, তুই কাঁদছিলি কাল। কেন সুমতি?

সুমতির সমস্ত শরীরটা যেন হিম হয়ে গেল। ঝিমঝিম ক'রে উঠল সর্বাঙ্গ। ভয় পেল সে।

—শুধু কালই নয়। শ্যামল বললে, আজকাল মধ্যে মধ্যে তুই কাঁদিস এমনি ক'রে। কি হয়েছে রে?

সুমতি আবার ঝরঝর ক'রে কেঁদে ফেলল। বললে—আমি যে পড়তে পারছি না বাবা।

তার পিঠের ভিজে চুলের উপর হাত বুলিয়ে দিয়ে উপীনবাবু বললেন—ডেয়ারীর কাজ থেকে মাস দুয়েক ছুটি নে তুই। সামনে একজামিন। আমি তোকে পড়াব। ছুটির ব্যবস্থা কর্ তুই।

চুপ ক'রেই দাঁড়িয়ে রইল সুমতি।

উপীনবাবু আবার বললেন—'না' করিস নে। বয়স হচ্ছে মা, বড় হচ্ছিস। ফেল করলে এর পর তোর নিজেরই লজ্জা করবে পড়তে। উৎসাহ ভেঙে যাবে।

ছুটির দরখাস্তই সে করল। সেই দিনই।

বাড়ী ফিরে এল একটু খুশি মনে।

উপীনবাবু বললেন—এই চিঠিখানা মিলি মাকে দিবি। বুঝলি। একখানা চিঠি দিলেন তার হাতে। খামে আঁটা চিঠি।

চিঠিখানা প'ড়ে মিলি সেন বললেন—তাই হবে। তুমি এক মাস আমার কাছেই থাকবে।

সুমতি অবাক হয়ে গেল। চিঠিতে তার বাবা কি লিখেছিলেন, সে তা জানত না। তাই অবাক হ'ল। কথাটা এই—

উপীনবাবু ভেবে দেখেছেন, সুমতি তাকে এমনই ভয় করে—ছেলেবেলা থেকেই সেটা জন্মেছে, যার জন্যে তিনি প্রাণপণ ক'রেও ওকে তৈরী করতে পারবেন না। যে অসঙ্কোচ স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে শিক্ষা গ্রহণ করলে সেটা নেওয়া যায়, মনে থাকে, সে অসঙ্কোচ স্বাচ্ছন্দ্য সুমতির আসবেই না তাঁর সামনে। তা ছাড়া তিনিও এই রোগের মধ্যে খিট্‌খিটে হয়ে উঠেছেন। তাঁর পক্ষেও সুমতির বুদ্ধির স্থূলতা সহ্য করা সহজ হবে না। তাই তিনি পুরনো ছাত্রীর কাছে মেয়ের জন্য এই অনুগ্রহ ভিক্ষা করেছেন।

সুমতি বললে—সে কি ক'রে হবে বাবা? আপনার, খোকার খাওয়াদাওয়া—

—সে ব্যবস্থা আমি করেছি মা। ঘোষেরা এক মাস আমাদের খাবার দিয়ে যাবে। র‍্যাশন দেব আর দুজনের জন্যে এক মাসে তিরিশ টাকা দেব ওদের। ওরা ওতেই রাজী হয়েছে।

একজামিনের পর সুমতি বাড়ী ফিরে এল।

এর মধ্যে একেবারে আসে নি তা নয়, তিন চার দিন এসেছে। একজামিন আরম্ভ হবার আগের দিন সন্ধ্যাতেও সে এসেছিল—বাবাকে প্রণাম করতে।

অপরাহ্ণ বেলা; দরজাটা খুলে দিয়ে শ্যামল দিদির মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

সুমতি প্রশ্ন করলে—কি ?

—কি রকম হয়ে গেছিস তুই !

কি রকম ?—সবিস্ময় এবং সকৌতুক হাসি ফুটে উঠল কালো মেয়েটির মুখে।

—কি জানি ! কিন্তু আর একরকম। খুব ঢ্যাঙা দেখাচ্ছে।

বাবাও বললেন তাই।—রোগা হয়ে গেছিস রে। খুব খেটেছিস, না ?

চুপ ক'রে রইল সুমতি।

বুকের ভিতরটা কেমন ক'রে উঠল। খাটতে চেষ্টা সে করেছে কিন্তু খাটতে পারে নি। সেই যে তার কি ক্লান্তি এসেছে, কি অনিদ্রা এসেছে, কি উদ্বেগ তাকে পীড়িত করছে—তার জন্য সে কিছুই করতে পারে নি। শুধু অনর্গল চীৎকার ক'রে পড়েছে, পড়েছে আর পড়েছে। কিন্তু মাথায় ঢোকে নি, মনে থাকে নি। সুতরাং কি বলবে সে ?

বাবা বললেন—যা, স্নান ক'রে ফেল্, কয়েকদিন খুব ঘুমিয়ে নে। আজ ওদের বাড়ী থেকেই খাবার আসবে। কাল থেকে আমাদের যা হয় করবি।

স্নান সেরে চুল আঁচড়াচ্ছিল সুমতি। শ্যামল ব'সে পড়ছিল। হঠাৎ সুমতির চোখে পড়ল, শ্যামল তার দিকেই তাকিয়ে আছে। চোখে চোখ পড়তেই শ্যামল চোখ ফিরিয়ে নিল।

ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে সুমতি বললে—শ্যামল !

শ্যামল উত্তর দিলে না, ঘর থেকে বেরিয়ে চ'লে গেল।

দোকানে নিরুপমা নেই। তার পা ভেঙেছে বুঝি। কোথায় কার সঙ্গে মোটরে বেড়াতে গিয়ে অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে। যাঁরা তাকে সাদরে আহ্বান

করতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। সবিস্ময়ে তার মুখখানি দুই হাতে ধ'রে আদর ক'রে বললে—কেমন সুন্দর হয়ে উঠেছ সুমতি!

সুন্দর! আমি!—হেসে ফেলল সুমতি।

—আরে বাপ রে! তুমি হাসতে শিখছে সুমি—সখি!

সুমি—সখি? লজ্জায় এবং অপরূপ একটা অনুভূতিতে সুমতি কেমন হয়ে উঠল। পরক্ষণেই সে যেন কিসের চিন্তায় মগ্ন হয়ে গেল। তার মনে প'ড়ে গেল—মলিদিদির বাড়ীতে বড় আয়নায় নিজের ছবি দেখেছিল। দিনের পর দিন সে দেখেছে নিজেকে। কালো মেয়ে। কিন্তু কি সুন্দর সে কালো মেয়ে! ঠিক এই মুহূর্তেই একখানা মোটর হর্ন দিয়ে এসে দাঁড়াল দোকানের সামনে। সুমতি চকিত হয়ে দেখল, সেই ববছাঁটা-চুল, বাটারফ্লাই গোঁপ ভদ্রলোক।

গাড়ী থেকে নেমে দোকানে ঢুকে বলল—মাখন এক পাউণ্ড।

কমলা বের ক'রে দিল এক পাউণ্ড মাখন।

মীরা মেমো লিখল। ভদ্রলোক নোট-কেস খুলে এক গোছা নোট বের ক'রে বেছে পাঁচ টাকার নোট একখানা বের ক'রে দিল সুমতির হাতে। সঙ্গে সঙ্গে বললে—আপনি বুঝি নতুন এলেন এখানে? সুমতি প্রখর দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল তার দিকে। নোটখানা এগিয়ে দিল মীরার হাতে।

দোকান বন্ধ ক'রে বাড়ী ফেরবার পথে—ঠিক সেইখানে মোটরখানা দাঁড়িয়ে ছিল। একটু দূর থেকেই গাড়ীখানা দেখতে পেল সে। আজ তার হাত-পা ঘামতে লাগল। বুকের ভেতরটা কেমন ক'রে উঠল। সে থমকে দাঁড়িয়ে গেল। একখানা বাস আসছিল। চীৎকার ক'রে উঠল—থাম। রোখো।

রুখল বাসখানা, উঠে পড়ল সে।

বাসখানা চলল। গাড়ীখানাও আসছে।

বুকের ভিতরটায় যেন রেলগাড়ী চলছে। তার ঝাঁকুনিতে সুমতির স্নায়ু-শিরা সমস্ত ঝাঁকি খেয়ে যেন বিপর্যস্ত হয়ে যাচ্ছে। হাত পা ঘামছে। কপালে নাকের ডগায় বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে। হাঁপাচ্ছে সে। ওঃ! কতক্ষণে সে বাড়ী গিয়ে পৌঁছবে!

বাস থেকে নেমে সে দ্রুতপদে বাড়ীর দিকে চলল। হঠাৎ একবার আপনার অজ্ঞাতসারেই পিছনের দিকে তাকাল। হ্যাঁ, সে আসছে। গাড়ীটা মোড়ে রেখে আসছে।

বাড়ীর কড়াটা সে প্রচণ্ড জোরে নেড়ে দিলে।

—শ্যামল!

পিছনে রাস্তার উপর একটা শিস বাজতে বাজতে চ'লে গেল—হু-হু, হু-হু, হু-হু, হু—

তাকালে না সে।

শ্যামল দরজা খুলতেই সে যেন ছুটে গিয়ে ঘরের ভিতর তক্তাপোষের উপর উপুড় হয়ে পড়ল।

—কি হ'ল দিদি?

—কিছু না।

শ্যামল একটু চুপ ক'রে থেকে বললে—বাবা আজ কাঁদছিলেন দিদি।

—কেন?

—তা জানি না। আমাকে বললেন, বিশ্বাসবাবুকে ডাকতে। আমি ডাকলাম। কি কথা বলছেন দরজা বন্ধ ক'রে।

—দরজা বন্ধ ক'রে কথা বলছেন?

বুকটা ধড়াস ধড়াস করতে লাগল। সুমতি সন্তর্পণে উঠে দরজায় কান পেতে দাঁড়াল।—বাড়ীটা ছাড়া তো কিছু নেই। ওর বিয়ে আমাকে দিতেই হবে। বড্ড বড় হয়ে গেছে। আমার আরও আগে চেষ্টা করাই উচিত ছিল। আপনি খদ্দের দেখে দিন।

সুমতি এক পা এক পা ক'রে পিছিয়ে এল। সে ভয় পেয়েছে।

বড্ড বড় হয়েছে ওর।

সে বড্ড বড় হয়ে গেছে। হাঁ, বড় হয়েছে—শুধু বড়ই নয়, এমন কালো রূপ তার কোথায় ছিল? কেমন ক'রে সর্বাঙ্গ ঘিরে ফুটে উঠল? সমস্ত ভিতর বাহির তার থরথর ক'রে কাঁপছে। ও-ঘরে বাবার নাক ডাকছে।

এই একটা সময়েই তাঁর ঘুম গাঢ় হয়—নাক ডাকে। দুই ঘরের দোরের কাছে শ্যামল ঘুমুচ্ছে। সুমতির ঘুম নেই। সে উপুড় হয়ে বালিশে মুখ গুঁজে প'ড়ে আছে। ভাবছে।

সে বড্ড বড় হয়ে গেছে। অপরূপ রূপ হয়েছে তার!

অনন্ত উল্লাস, দুরন্ত ভয়ে উদ্বেগের মত একটা অনুভূতিতে সে আচ্ছন্ন হয়ে গেল। বুকের ভিতর উদ্বেগ, মাথার মধ্যে অসীম শূন্যতা। সে উঠে এসে দাঁড়াল বাইরের এক ফালি বারান্দায়।

চৈত্র মাস। ঈষদুষ্ণ হাওয়া বইছে। মাথার উপরে চাঁদ ভাসছে। চাঁদের আলোয় উড়ে বেড়াচ্ছে বড কালো রঙের একটা প্রজাপতি। প্রাচীরের ইটের ফাকে কোথায় ঝিঁঝি ডাকছে।

হঠাৎ সে চমকে উঠল।

বাইরে শিসের শব্দ উঠছে—হু-হু, হু-হু, হু-হু, হু—

হু-হু, হু-হু, হু-হু, হু—! হু-হু, হু-হু, হু-হু, হু—। সঙ্গে সঙ্গে জুতোর শব্দ উঠেছে। এদিক থেকে ওদিক। ওদিক থেকে এদিক।

ভয়ে সে অধীর হয়ে গেল।

উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল রোয়াকের উপর।

তার বুকের ভিতর তার চেতনা যেন কালো সমুদ্রের মধ্যে ডুবে তলিয়ে চলেছে—সেই আদিম কালে। কাল থেকে কালান্তর পশ্চাতে—তারও পশ্চাতে আর এক কালান্তরে—আরও পিছনে—প্রস্তরযুগে, অরণ্যযুগে ঘন বৃক্ষপল্লবে ঢাকা অন্ধকার অরণ্যভূম, তার মাথার উপর আকাশ নক্ষত্র জ্যোতির্মণ্ডল ঢাকা পড়েছে—বনস্পতির শাখা পল্লব এবং লতা-জালের ঘন বেষ্টনীতে। রাত্রিকালে ঘন অন্ধকারে যেন ছায়ামূর্তির মত বিচরণ ক'রে বেড়াচ্ছে কৃষ্ণাঙ্গী তরুণী—চোখ দুটির শুভ্রচ্ছদের নীচে চোখের তারায় বিচ্ছুরিত হচ্ছে ব্যাঘ্রীর অন্ধকারভেদী দৃষ্টি। কোন দূরান্তর থেকে ভেসে আসছে কোন ইশারা। গাছের শাখায় আলোড়ন হচ্ছে। তরুণী লুকোচ্ছে বৃক্ষকাণ্ডের আড়ালে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখছে—কি আসছে! সরীসৃপ, চতুষ্পদ অথবা পেশীবহুলবাহু কোন মানুষ চ'লে আসছে গাছে গাছে।

নাক দিয়ে নিশ্বাস টানে জোরে জোরে। কিসের গন্ধ ?

সুমতি সেন্টের গন্ধ পাচ্ছে।

ধীরে ধীরে চেতনা তার আবার উপরের দিকে উঠতে লাগল। সমুদ্রের তলদেশের অক্টোপাস—উদ্যত পাশ থেকে পাশ কাটিয়ে কত প্রবাল কীটের গড়া স্বপ্নরাজ্যের মধ্য দিয়ে সে উঠতে লাগল। স্মরণ করলে সে কত যুগের কত কাহিনী। উঠল সে উপরে।

মাথার উপরে জ্যোতির্মণ্ডল। চাঁদ ঝলমল করছে, ওই দূরে শুক্রাচার্য ধকধক করছে। ওই কালপুরুষ, ওই লুব্ধক, ওই সপ্তর্ষি, ওই অরুন্ধতী, ওই ধ্রুব।,

জোয়ার জাগছে সমুদ্রে। সে চাঁদের কাছে পৌঁছে দিতে চায়, ওই জ্যোতির্লোকে পৌঁছে দিতে চ'য় কালো মেয়েটিকে।

সুমতি বার বার ঘাড় নাড়ল। বার বার। তার চুলের রাশি খুলে পড়ল ; তাকে যেন আবৃত ক'রে দিল।

সে নিজেকে বুঝেছে—নিজেকে সে জেনেছে। ধীরে ধীরে চাঁদ ঢ'লে পড়ল পশ্চিম আকাশে, মহানগরীর প্রাসাদশিখর বৃক্ষশীর্ষের ওপারে গিয়ে রক্তাভ হয়ে পড়ল ; মাটিতে জাগল অন্ধকার, আকাশের পূর্বদিগন্ত হ'ল অন্ধকার, মধ্যাকাশে জ্যোৎস্নার আভা রক্তাভ হ'ল—ক্রমে ম্লান হ'ল। অগণিত তারা ফুটল আকাশে। রাত্রি অন্ধকার হয়ে, হয়ে উঠল তামসী। পূর্বদিগন্তের আলোকের তপস্যায় মগ্ন হ'ল।

ঘুমিয়ে পড়ল সুমতি।

সকালে ঘুম ভাঙল তার শ্যামলের ডাকে—দিদি—দিদি !

ঘর থেকে উপীনবাবু বললেন—কে ? সুমতি কোথায় ?

—এই বাইরে শুয়ে আছে।

—বাইরে ? রোয়াকে ? সুমতি ? সুমতি !

জেগে উঠল সুমতি। কিন্তু ধড়মড় ক'রে উঠে বসল না। লজ্জিত হ'ল না। ধীরে ধীরে কালো চুলের রাশি সম্বৃত ক'রে, বেশবাস সংযত ক'রে উঠে বসল। হাতে জড়িয়ে চুলগুলি এলোখোঁপায় বেঁধে নিল।

—সুমতি !

সুমতি ধীরে ধীরে গিয়ে দাঁড়াল বাপের পায়ের দিকে—তাঁর চোখের সামনে।

—বাইরে শুয়েছিলি কেন সুমতি ? বড় হয়েছ মা। এ তো ঠিক নয়। গরমের সময় গরম তো লাগবেই।

চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল সে।

—যাও, স্নান সেরে ফেল, তোমার দোকানের দেরি হয়ে যাবে।

তবু সে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকল।

—সুমতি !

—বাবা।

— দাঁড়িয়ে কেন মা ?

অকস্মাৎ সুমতি তাঁর পঙ্গু পা দুটির উপর উপুড় হয়ে প'ড়ে কাঁদতে লাগল।

—সুমতি ! কি হ'ল ?

—আমার বিয়ে দেবেন না বাবা ! না—না—বাবা, আমি কালো। না—

তার এই অপরূপ কালো রূপকে যে ভাল বাসবে, তার জীবনে যে উদিত হবে, সে হবে শ্রেষ্ঠ রূপবান। তার প্রতীক্ষা করবে সে। রাত্রির মত সূর্যের তপস্যা করবে সে।

বিষ্ণু চক্রবর্তীর কাহিনী

পৃথিবীতে এক ধরণের লোক আছে যারা স্থিরসিদ্ধান্ত ক'রে নিয়েছে যে, মানুষের মধ্যে আসলে ভাল কিছু নাই। অধিকাংশ লোক আগা-পাশতলা পাজী; যে যা করে নিজের মতলবে। বিশেষ ক'রে যে লোকগুলো ধর্ম এবং সংস্কার মেনে চলে, যারা লেখাপড়া জানে না, তাদের মত জটিল এবং কুটিল প্রকৃতির জীব আর নাই। লেখাপড়া শিখেও যারা ধর্ম মানে তাদের বলে ভণ্ড। বুদ্ধ গান্ধী কাউকে তারা বাদ দেয় না। প্রমাণ ক'রে দেয়—অহিংসা শুদ্ধচিত্ততা ওসব হ'ল বুলি, লোককে ভাঁওতা দেবার একটা ফিকির। আসলে দুনিয়ার মাথায় চেপে ব'সে মজাদার রাজত্বি চালিয়ে যায়।

আর অশিক্ষিত লোক যারা, তাদের সম্পর্কে বলে—মানুষ সর্বোচ্চ স্তরের হ'লেও আসলে হ'ল জানোয়ার। জানোয়ারের প্রকৃতি আর তাদের প্রকৃতিতে তফাতটা কোথায়? তফাত হয় শিক্ষায়। সুতরাং সে শিক্ষা যার নাই সে একেবারে জন্তু। এদের সম্পর্কে সাবধান। তুমি খাচ্ছ—সে ক্ষুধার্ত, সে কেড়ে খাবে। লোক থাকলে ভয়ে খাবে না, না-থাকলে খাবে। তোমার টাকা আছে—তার নাই, সুযোগ পেলেই সে কেড়ে নেবে, দরকার হ'লে খুন ক'রে কেড়ে নেবে। এদের হিংসে লোভ রাগ এই সব ছাড়া আর কিছু নাই, থাকতে পারে না।

এই ব'লে সে নজীর হিসেবে চোর-ডাকাতদের নাম ক'রে যায়—যারা সব অশিক্ষিত মূর্খ। এসব মানুষকেই সে বিশ্বাস করে না।

তবে ঘাড় নেড়ে বিজ্ঞভাবে বলে—তবে হ্যাঁ, বিশ্বাস করতে পার, শিক্ষিত মানুষ যারা, যারা শুধু শিক্ষা এবং বিজ্ঞানকে মানে তাদের। আমি তাদেরই বিশ্বাস করি। কারণ এরা সুশিক্ষিত মানুষ জানোয়ার। শিক্ষিত জানোয়ার দেখেছ? সার্কাসে দেখতে পাবে, অনেকের ঘরেও পাবে;

হিংস্র বাঘ—মানুষের সঙ্গে খেলা ক'রে যাচ্ছে দিনের পর দিন। যা শিখিয়েছে, সেইগুলি ক'রে যাচ্ছে হুকুম মাফিক। কুকুর তো আরও আশ্চর্য। বানর শিম্পাঞ্জীর তো কথাই নাই। সাধারণ চাকরের সঙ্গে সে পাল্লা দিয়ে কাজ করে। তারা অকপট। দয়া মায়া প্রেম এ সবের ভণ্ডামি নাই। শুধু বোঝে, এইগুলি হুকুমমত ক'রে গেলে মানুষ আমাকে খেতে দেবে। সেবাও খানিকটা করবে। না করলে মার দেবে। লড়াই করতে গেলে মরব, গুলি ক'রে মেরে দেবে। জানোয়ারদের মধ্যে সর্বোচ্চ স্তরের জানোয়ার মানুষ যখন শিক্ষা লাভ ক'রে অকপট থাকে—যখন স্বীকার করে এই সত্যকে, তখন তারাই হ'ল আসল সুসভ্য বৈজ্ঞানিক মানুষ, তাদেরই বিশ্বাস করতে পার। কারণ তারা জানে, বোঝে—মারতে গেলেই মারতে আসবে, ভেঙচি কাটলেই অন্যেও ভেঙচি কাটবে, গালাগালি দিলে গালাগালি খাবে। প্রকাশ্যে খুন করলে—খুন হবে, অন্য লোকেরা তোমাকে খুন করবে। গোপনে করলেও ফাঁসী যাওয়ার সম্ভাবনা একশোর মধ্যে অন্ততপক্ষে পঞ্চাশ ভাগ। পরের পকেট কাটলে ধরা পড়লে তোমার রক্ষা থাকবে না। চুরি করলে জেল হবে। এ সব ক'রে ধরা তুমি নাও পড়তে পার—এটা অবশ্য ঠিক ; কিন্তু এর জন্যে তোমাকে যে উদ্বেগ ভোগ করতে হবে, তার ধাক্কা জেলের ধাক্কা থেকে কম নয়, বরং বেশী। এদের বিশ্বাস ক'রো।

অন্যদের বিশ্বাস যারা করে—অর্থাৎ ধার্মিকদের—তারা নিজেরাও হ'ল ভণ্ড। মূর্খদের যারা বিশ্বাস করে তারা হ'ল গণ্ডমূর্খ।

পুলিশ রিপোর্ট সন্ধান ক'রে দেখ, জেলখানা ঘুরে এস—দেখবে, চোর ডাকাত খুনে বদমাস—এদের একশো জনের মধ্যে পঁচানব্বুই জন মূর্খ অর্থাৎ অশিক্ষিত ; আর এদের মধ্যে অন্তত পঁচিশ-তিরিশ জনকে পাবে—যারা সন্ন্যাসীর বেশে ঘুরত।

জাল জালিয়াতি যারা করে তাদের মধ্যে পাবে—একশো জনের মধ্যে আশীজন সমাজে ধার্মিক লোক ছিল। ফোঁটা তিলক কাটত। গলায় মালা পরত। জপ করত।

ঠিক এই ধরণের মানুষ—বিষ্টু চক্রবর্তী।

ঈশ্বর মানে না, ধর্ম মানে না, মানে শুধু বিদ্যাকে অর্থাৎ বিজ্ঞানকে। এবং বৈজ্ঞানিক সত্যকে একেবারে অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলে। এ কথা তার পরম শত্রুও বলবে যে, বিষ্টু চক্রবর্তী কখনও জীবনে কারও কোন অনিষ্ট করে নাই। আবার কেউ ক্ষতি করলে তাও সহ্য করে নাই—শোধ নিয়েছে। কোনদিন যদি তুমি তার ট্রামের ভাড়াটি আগেভাগেই দিয়ে টিকিট কেটে থাক কি এক খিলি পান কিনে খাইয়ে থাক, তবে সে প্রথমটা নগদ দাম মিটিয়ে দিতে চাইবে এবং দেবেও। নেহাত বন্ধুত্বের খাতিরে সেটা যদি না পারে তবে ঠিক দু-একদিন পরেই একদিন তোমার খোঁজ ক'রে এসে ধ'রে নিয়ে ট্রামে উঠবে এবং তোমার টিকিটটি কেটে ধার শোধ-বোধ ক'রে ছাড়বে। পানের দেনা শোধ অত্যন্ত সহজ, বাড়ী গিয়ে এক খিলি পান হাতে দিয়ে বলবে—খাও। আবার তুমি যদি কোথাও তার কোন নিন্দে কর এবং সে কথা যদি তার কানে ওঠে, তৎক্ষণাৎ উকীল-বাড়ী গিয়ে তোমাকে নোটিশ দেবে যে, এই এই লোকের সম্মুখে এই তারিখে এই স্থানে তুমি আমার মক্কেলের সম্পর্কে যে সব মানহানিকর উক্তি করেছ তার জন্যে তুমি অবিলম্বে ক্ষমা প্রার্থনা না-করলে তোমার নামে মানহানির নালিশ দায়ের করা হবে।

একটা ঘটনার কথা বললেই বিষ্টু চক্রবর্তী কেমন লোক সঠিক বুঝতে পারা যাবে। আজকাল ট্রাম-বাসের ভিড়ের কথা বর্ণনা ক'রে বলতে হবে না। বিশেষ ক'রে সাড়ে ন'টা থেকে এগারটা আবার চারটে থেকে ছ'টা। সেদিন কি একটা কাজে তাকে ঠিক ন'টার সময় ট্রামে চড়তে হ'ল। যাবে কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট থেকে হেদুয়ার মোড়। হিসেবনিকেশ ক'রে শ্যামবাজার-ট্রাম-ডিপো পর্যন্ত হেঁটে গিয়ে ট্রামে উঠে ট্রামের ভিতর ঢুকবার দরজার পাশেই কণ্ডাক্টারের বসবার জায়গায় বসল। তাড়াতাড়ি নামবার সুবিধে হবে। ভিড় বাড়বার সময় হয়েছে, মোড়ে মোড়ে পানের ডিবে, খাবারের কৌটো হাতে আপিসের বাবুরা ভিড় ক'রে দাঁড়িয়ে আছে, হুড়মুড় ক'রে উঠে পড়বে; হাতিবাগানের মোড় পর্যন্ত যেতে না-যেতেই বোধ হয় কুঁচকি-কণ্ঠা

ঠাসা হয়ে যাবে। এর ভিতর দিয়ে পথ ক'রে বের হওয়া তো সহজ কথা নয়। স্টমাক পাম্পের মত কোন শক্তিশালী যন্ত্রের সাহায্যে ভিন্ন প্রায় অসম্ভব। তাই গলার কাছাকাছি থাকার মত ওই মোড়েই ব'সেছিল। ফড়েপুকুরের মোড়ে হঠাৎ এক ভদ্রলোক উঠলেন—হ্যা-হ্যা শব্দে হাসতে হাসতে। ভিতরে কোন এক বন্ধুকে দেখে বিগলিত হয়ে গেছেন উল্লাসে উচ্ছ্বাসে।—এই যে ব্রাদার—

চোখ দুটো স্বাভাবিক ভাবেই সেই ব্রাদারের উপর। কাজেই কোথায় কার গায়ে বা পায়ে পা ফেলছেন তার হিসেব নাই। এবং জুতোসুদ্ধ একখানি চরণ বিষ্টু চক্রবর্তীর পায়ের অর্থাৎ জুতোর উপর। বিষ্টু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন লোক, জুতো নিত্য পালিশ করে, এবং নিজের হাতেই করে। চকচকে জুতোর উপর ভদ্রলোক অপরিষ্কার জুতো দিয়ে মাড়িয়ে বেশ হাসতে হাসতেই আর একপা ওঠালেন—ভিতরে যাবেন। সঙ্গে সঙ্গে বিষ্টু তার হাত চেপে ধরলে।—এ কি ?

—ভেতরে যাব।

—যান, তাতে আপত্তি নেই। কিন্তু আমার পা মাড়িয়ে যাবেন কেন ?

এতক্ষণে ভদ্রলোক নীচের দিকে তাকিয়ে দেখলেন—বিষ্টুর পা মাড়িয়েছেন। ভদ্রলোক পান-খাওয়া জিভ কেটে ফেললেন এবং পা সরিয়ে নিয়ে বললেন—এ-হে-হে ! অন্যায় হয়ে গেছে।

বিষ্টু দেখলে জুতোর কালো বার্নিশের উপর ধুলো-কাদার ধূসর পদচিহ্ন চমৎকার একখানি ছবির মত ছাপা হয়ে গিয়েছে—সাদা সিল্ক-টুইলের জামার উপর কাদামাখা একখানি ফুটবলের ছাপের মত।

ভদ্রলোকও সে চরণাঙ্কিত অপরূপ চিত্ররূপ দেখে ব'লে উঠলেন—এ-হে-হে ! কিছু মনে করবেন না স্যার। মাফ করবেন।

হুঁ। মাফ করছি। দাঁড়ান।—ব'লেই ভদ্রলোকের জুতোসুদ্ধ পায়ের উপর নিজের চরণখানি রেখে উঠে দাঁড়িয়ে বেশ ক'রে চাপ দিয়ে বললে—যান এইবার, মাফ করেছি।

ব'লেই ট্রাম থেকে নেমে একখানা চলন্ত ট্যাক্সি ডেকে তাতেই চেপে চ'লে গেল। কারণ এর পরই ঝামেলা হবার কথা। নানাপ্রকার আলোচনা হবে—ভাল মন্দ দুইই। ভালর জন্ম ধন্যবাদ দিতে হবে। মন্দের জন্ম ঝগড়া করতে হবে, না-হ'লে নাম ঠিকানা সংগ্রহ ক'রে উকীলের পত্র দিতে হবে।

উকীলের সঙ্গে মাসিক বন্দোবস্ত। মাসিক পনের টাকা এবং টাইপ করার খরচা। দুখানা চিঠি হ'লেই টাইপ করতেই লাগবে দেড় টাকা। চিঠি টাইপ করতে হবে দুখানার বেশী নিশ্চয়। ট্রাম-ভর্তি লোকের মধ্যে ঝগড়া হবে—দশ-পনের জনের সঙ্গে তো বটেই। তাতে অনেক খরচা। তার থেকে এক টাকা খরচ ক'রে ট্যাক্সিতে হেদুয়া যাওয়া অনেক ভাল। এই হ'ল বিষ্টু চক্রবর্তী।

এ হেন বিষ্টু চক্রবর্তী সে দিন দেশভ্রমণে বেরিয়ে পড়ল। অনেক দিন আগে থেকেই সে এজন্যে টাকা সংগ্রহ করছিল। ব্যাঙ্কে সেভিংস অ্যাকাউণ্ট খুলে ব্যাঙ্কের বাক্স নিয়েছিল, কোনদিন আনি, কোনদিন সিকি আধুলি জমিয়ে—মাসের শেষে জমা দিয়ে আসত ব্যাঙ্কে। যেদিন ব্যাঙ্কের খাতায় জমা টাকার অঙ্ক উঠল পাঁচশো টাকার উপর, সেই দিন সে একখানা টাইম টেবিল কিনে আনল এবং কয়েকখানা ভ্রমণকাহিনী নিয়ে এল লাইব্রেরী থেকে। তারপর সুরু করলে হিসেব এবং একখানা খাতায় লিখতে লাগল দ্রষ্টব্য স্থানগুলির নাম। পুরো একখানি একসারসাইজ বুক ভর্তি হয়ে গেল। তারপর একদিন বেরিয়ে পড়ল।

থার্ড ক্লাসের যাত্রী। তবে সরঞ্জাম নিল দস্তুরমত। শীতকাল—বিছানা, গরম কাপড় চোপড় যথেষ্ট নিলে, মায় ব্যালাক্লাভা টুপি। লোটা, মগ, গেলাস, ছোট আকারের ডিশ, থার্মোফ্লাস্ক, চায়ের কাপ ছাড়াও নিলে ডজন ছয়েক যুদ্ধের বাজারের কাগজের গেলাস। তার দু-চারটে সর্বদা রাখবে পকেটে। এ ছাড়া সূচ সুতো ছুরি কাঁচি, খানিকটে মজবুত দড়ি, একটা দা, একটা স্কাউটিং ছুরি, টিন-কাটার, কর্কস্ক্রু, টিংচার আইডিন, বেনজিন, বোরোফ্যাক্স, কাপড়-কাচা সাবান, গায়ে মাখা সাবান, একটা শিশিতে স্পিরিট,

এক প্যাকেট বোরিক তুলা, খানিকটা ব্যাণ্ডেজ, কুইনিন, ইনফ্লুয়েঞ্জা ট্যাবলেট, এম-বি ৬৯৩, পেনিসিলিন অয়েণ্টমেণ্ট, পেপ্‌স, একটা থারমোমিটার, আরও অনেক কিছু মায় একটা স্পিরিট স্টোভ পর্যন্ত। একটা বালতী এবং একটা ঢাকনিওয়ালা সাজি বোঝাই হয়ে গেল। মোট কথা খাঁটি স্বরাজ গাঁটরীতে বেঁধে একটা ট্যাক্সিতে চাপিয়ে বাড়ী থেকে রওনা হ'ল।

বিষ্টুর মা ছেলের জ্বালায় জ্ব'লে মরেন। তিনি এই বিচিত্র ছেলেটিকে ঠিক বুঝতে পারেন না। তিনি চিন্তিত হলেন। বললেন—বাবা, যা কর ঘরে কর, বিদেশ বিভুঁয়ে একটু সাবধানে চ'লো বাবা।

বিষ্টু বললে—ঠিক আছে।

মা বললেন—ঝগড়াঝাঁটি কারুর সঙ্গে ক'রো না। সকলের সঙ্গে মিলেমিশে চ'লো। মিষ্টি কথা ব'লো।

বিষ্টু বললে—ঠিক আছে।

মা বললেন—সাবধানে থেকো।

বিষ্টু আবার বললে—ঠিক আছে মা, ঠিক আছে।

—হ্যাঁ হ্যাঁ বাবা, ঠিক থাকবে বইকি। বুদ্ধিমান ছেলে তুমি।

এবার বিষ্টু চ'টে গেল। বললে—এম-এ পাস করেছি মা। এত সাবধান করবার দরকার নেই। সব ঠিক আছে।

বুদ্ধি বিষ্টুর সত্যই আছে। সে থার্ড ক্লাসে যাবে, সুতরাং দিল্লী মেল বা তুফান মেল কি পাঞ্জাব মেল এই সব নামজাদা ট্রেনে যাওয়ার মতলব ছেড়ে মাঝারি গাড়ী—যাকে বলে ফাস্ট প্যাসেঞ্জার—তাতেই রওনা হ'ল, এবং বেছে বেছে লাইনও ঠিক করলে ওই ধরনের। যে লাইনে ঘুরপথ—যে লাইনে বড় বড় ব্যবসার জায়গা কম—তেমনি লাইন লুপ সে বেছে নিলে। আরও একটু কথা ছিল—প্রথমেই সে যাবে পাকুড়; পাকুড় মার্ডার কেস হওয়ার পর থেকেই তার পাকুড় দেখবার বড় ইচ্ছে ছিল। তারপর যাবে গৈবীনাথ। গৈবীনাথের উপর ভারী আকর্ষণ বিষ্টুর। একেবারে গঙ্গার বুকের মধ্যে উঠেছে পাহাড়। সেই পাহাড়ের উপর গৈবীনাথের মন্দির, গৈবীনাথের মন্দিরের ছবি সে কাগজে দেখেছে। চমৎকার লেগেছে। গৈবীনাথ থেকে মুঙ্গের।

জামালপুরের রেল কারখানা। তারপর ওখান থেকে সটান বক্তিয়ারপুর জংশন। বক্তিয়ারপুরে নেমে বিহার, রাজগীর, নালন্দা দেখে, পাটনা। পাটনা থেকে গয়া, বৌদ্ধগয়া। তারপর গয়ায় আবার ট্রেনে চেপে মোগলসরাই, কাশীধাম-বারাণসী।

ট্যাক্সিতে চড়বার সময় আবার মা বললেন—দেখিস বিষ্টু, খুব সাবধান কিন্তু। যেখানে-সেখানে কিছু খাস নে।

—আমি টি-এ-বি-সি ভাকৃসিন ইনজেকশন নিয়েছি। ভয় ক'রো না, কলেরা, টাইফয়েড সহজে কাবু করতে পারবে না।

মা এবার গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—না। সে কথা আমি বলি নি।

—অ। তা হ'লে সেই পুরনো গল্পটা বলছ! সেই হাতকাটা কবরেজের গল্প! সেটা আমি বিশ্বাস করি। এবং সে বিষয় আমি নিশ্চয় সাবধান হব! তুমি নিশ্চিন্ত থাক।

ব'লেই সে ট্যাক্সিতে গিয়ে উঠল।

মা ছুটে গেলেন। ডাকলে 'পিছুডাকা' হবে। নিজেই ট্যাক্সির দরজা খুলে একটি ফুল তার হাতে দিয়ে বললেন—আমার নিজের পুজো করা পুষ্প। পকেটে রাখিস, ফেলে দিস নি।

পকেটে অবশ্য সে পুরলে, কিন্তু মনে মনে বললে—রাবিশ।

ট্রেনে উঠে পকেট থেকে ফুলটা বের ক'রে ফেলে দিতে গেল, জানলা দিয়ে হাত বাড়াল। ফুলটা কাল বাসি হবে, পরশু থেকে পচতে সুরু করবে দুর্গন্ধ উঠবে, জামায় দাগ ধরবে। কিন্তু ফেলে দিতে গিয়েও মনটা কেমন ক'রে উঠল। থাক্, মা এমন ক'রে বললেন! তবে জামার পকেটে নয়, একটা বালতীর মধ্য থেকে ফার্স্ট এডের বাক্সটা বের ক'রে তার মধ্যে রেখে দিল।

চমৎকার জায়গা গৈবীনাথ।

একেবারে মাঝগঙ্গায় একটি ছোট পাহাড় জল ঠেলে মাথা তুলে উঠেছে। যেন মৈনাক পাহাড় বা তার জ্ঞাতিগোষ্ঠীর, যারা ইন্দ্ররাজার নির্যাতনের ভয়ে

জলের তলায় আত্মগোপন করেছিল—তাদেরই কেউ গঙ্গার জলের তলায় চিৎ হয়ে শুয়ে আছে আর তার নাকের ডগাটি জল ঠেলে উঠে পড়েছে। এবং পাছে সেই ডগাটুকু কেউ কেটে নেয় তারই জন্য ডগার উপর একটি শিবঠাকুর বসিয়ে রেখেছে। তবে জায়গাটি ভাল। চারিদিকে জলস্রোত ছলছল-কলকল ক'রে ব'য়ে যাচ্ছে; শীতের গঙ্গার জল স্ফটিকশুভ্র;—আর তার উপর অবারিত রৌদ্রচ্ছটা ঝকমক ঝলমল করছে। কালো কতকগুলি বিশালকায় পাথরের চাঁই একজোট হয়ে স্তূপের মত উঠেছে—তার ফাঁকে ফাঁকে ছোট বড় কতকগুলি গাছ। স্ফটিকশুভ্র পটভূমিতে সবুজ কালোর সমাবেশ এবং তার মাথায় কয়েকটি সাদা টোপা। ওগুলি মন্দির। বাবা গৈবীনাথকে হয়তো পাহাড়টা নিজেই বসিয়েছিল; কিন্তু তারপর মানুষ এসে আরও অনেক কারচুপি করেছে। সুড়ঙ্গ বানিয়েছে, একটা চাঁই থেকে আর একটা চাঁইয়ে যাবার জন্য সাঁকো বানিয়েছে। এখানে ওখানে পাহাড়ের নাকের আঁচিলের মত মন্দির বানিয়ে কোনটায় বসিয়েছে মা-দুর্গাকে, কোনটায় কাউকে, কোনটায় কাউকে। এবং কপালে তিলক কেটে গলায় রুদ্রাক্ষ প'রে পয়সা পয়সা ক'রে অনর্গল মিথ্যে কথা ব'লে যাচ্ছে।

রাবিশ!—মনে মনেই বললে বিষ্টু। এমন সুন্দর জায়গাটাকে মাটি ক'রে দিয়েছে। ধর, মোজেক কি মার্বেলের মেঝেয় ঘরের মধ্যে যেন বিষমুখ লাল পিঁপড়ের ঝাঁক ঘুরে বেড়াচ্ছে। নিশ্চিন্ত হয়ে বসবার কি শোবার উপায় নাই। ছেঁকে ধরবে তোমাকে, কুটকুট ক'রে কামড়াবে।—রাবিশ! এর উপরে আছে সন্ন্যাসী। সাধারণ পাতিকাকের মধ্যে ও আবার দাঁড়কাক। গাঁজা খেয়ে গলা যেমন মোটা তেমনি দাবি। পয়সা না দিলে চোখ পাকিয়ে বলবে—ভরষ্ট্ আদমী, পাপাচার, ভসম্ কর্ দেগা। নরকমে যায়েগা।

বিষ্টু হেসে বললে—তথাস্তু। কিন্তু সেখানে তোমরা যাবে না তো? দেখো! বাবা গৈবীনাথের কসম খেয়ে বল।

এ রসিকতা সন্ন্যাসী পাণ্ডা এরা কেউ বুঝতে পারে না। বলে—কেয়া? কেয়া বোলতা হ্যায়?

—রাবিশ !

ব'লেই হাসতে হাসতে এসে ভাড়ার নৌকায় বিষ্টু চ'ড়ে ব'সে বললে—চালাও।

—আরে আরে, পরসাদ, পরসাদ তো লেও। এ বাংগালী বাবু !

—তুম খা লেও বাবা ! নেহি তো গঙ্গাজীমে ডার দেও।

প্রসাদ ! প্রসাদে তার বিশ্বাসও নাই, প্রয়োজনও নাই। পাথরের দেবতা, তাও শিব—না মাথা, না মুণ্ডু ! দেবতা কোন কালে তো খায় না, দেবতার নাম ক'রে এই ভণ্ডগুলো খেয়ে আসছে চিরদিন। এবং এই প্রসাদের নাম ক'রে কত যে চুরি জোচ্চুরি ক'রে আসছে এরা, সে সব একসঙ্গে ক'রে লিখলে সে দেব-মহিমার রিপোর্ট একশোটা মহাভারতের কলেবরের চেয়েও বিরাটতর কলেবর হ'ত। এবং অশিক্ষিত অবৈজ্ঞানিক মনোভাবসম্পন্ন মানুষদের শৃগাল বা হায়েনা চরিত্রের স্বরূপ প্রকাশিত হ'ত। মহাভারতের অলৌকিক গল্পগুলির চেয়েও অনেক কল্যাণ সাধন করত মানুষের সমাজের।

জামালপুরের ট্রেনে চেপে বসল সে। এখান থেকে জামালপুর, জামালপুর থেকে মুঙ্গের। বাংলাদেশের শেষ স্বাধীনতার যুদ্ধ হয়েছিল কাটোয়া গিরিয়া উধুয়ানালায়। তার আয়োজন হয়েছিল মুঙ্গের থেকে। মীরকাশিম এই মুঙ্গেরেই নিয়ে এসেছিলেন তাঁর রাজধানী। তার আগেও মোগল আমলে এখানে একটা নবাবী আড্ডা ছিল। তার অধিকাংশই অবশ্য সেই ভীষণ বিহার ভূমিকম্পে ভেঙে ধূলোর মত গুঁড়ো হয়ে গেছে, তবুও অল্প কিছু আছে। তাই দেখে যাবে।

ট্রেন জামালপুর পৌঁছবে সাড়ে আটটায়। ওখান থেকে ট্রেন বদল ক'রে ব্র্যাঞ্চ লাইনের মুঙ্গের একটা স্টেশন, কিন্তু পৌঁছতে রাত্রি প্রায় এগারোটা। মনটা খুঁতখুঁত ক'রে উঠল। বারোটায় মুঙ্গেরে নেমে কোথায় যাবে ? স্টেশন প্ল্যাটফর্মে থাকা যায় অবশ্য, কিন্তু—। একটা কিন্তু এসে ঢুকে গেল মনের মধ্যে। মনে প'ড়ে গেল মায়ের কথা। মায়ের সেই গল্পের কথা।

এমনি সারারাত্রি প্ল্যাটফর্মে শুয়ে ছিলেন মায়ের মামা; তাঁর সব চুরি হয়ে গিয়েছিল।

মায়ের কাকা ছিলেন দুঁদে লোক। তিনি মাঝরাত্রে এমনি অপরিচিত জায়গায় গাড়ী ক'রে বেরিয়েছিলেন হোটেলে যাবেন ব'লে। গাড়ী একেবারে শহরের বাইরে নিয়ে গিয়ে ভদ্রলোকের যথাসর্বস্ব অপহরণ ক'রেই ক্ষান্ত হয় নি, একেবারে উলঙ্গ ক'রে একটা গাছের সঙ্গে বেঁধে রেখে চ'লে গিয়েছিল ;—যাবার সময় একটা সেলাম ক'রে গিয়েছিল—সেলাম হুজুর ! মজেসে আরাম করিয়ে !

এই বিহার প্রদেশেই মায়ের অনেক আত্মীয়-স্বজন আছেন। তাঁদের কাছে গল্প শুনে মা সেই সব গল্প বলেন এবং প্রমাণ করেন—এদেশের লোক যত সাংঘাতিক তত রসিক।

জামালপুর পৌঁছতে পৌঁছতে ঘড়িতে বাজল সাড়ে নটা। এবং এরই মধ্যে ওই ছোট 'কিন্তু'টা আকারে মস্ত বড় হয়ে উঠল। বিন্ধ্য পর্বতের সূর্যের পথ বন্ধ করার মতই অবস্থা হয়ে উঠল। মুঙ্গের যাবার ইচ্ছায় আর ওই 'কিন্তু' লঙ্ঘনের শক্তি রইল না। নিজের উপরেই বিরক্ত হয়ে উঠল বিষ্টু। বুদ্ধি দিয়ে যুক্তি দিয়ে বিচার ক'রে দেখে দেখলে, কালে কস্মিনে দুটো চারটে লোকের প্ল্যাটফর্ম থেকে জিনিস চুরি গিয়েছে। ওই দুটো চারটে লোকের যথাসর্বস্ব অপহৃত হয়েছে ভাড়ার গাড়ীতে। লক্ষ লক্ষ লোকে নিরাপদেই প্ল্যাটফর্মে কাটাচ্ছে, রাত দুপুরে গাড়ী ক'রে শহরের ভিতরে নিরাপদে গিয়ে পৌঁছচ্ছে। সুতরাং এ ভয় কেন ? এ ভয় তো ইডিয়টিক। উল্লুক মূর্খের মত ভয় এটা। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, ভয় কিছুতেই বাগ মানল না।—কেন, এ কথার উত্তর দিলে না। বুদ্ধিমান শিক্ষিত বিষ্টুকে গ্রাহ্যই করলে না। কাছে-পাওয়া মানুষের ঘাড়ে ব্রহ্মদৈত্যের মত চেপে দু পায়ে ঘাড়টি ছেঁদে চেপে ব'সে চাপ দিতে লাগল। কিছুতেই তাকে নামানো গেল না ঘাড় থেকে। জামালপুর নেমে ব্যাপারটা এমন দাঁড়াল যে, স্বচ্ছন্দে ব্যাপারটাকে ব্যাখ্যা ক'রে বলা যায়—"ভূতের ভয়ে উঠলাম গাছে, ভূত বলে আমি পেলাম কাছে।"

সারাটা দিন গৈবীনাথে কেটেছে, দেবতার রাজত্বে, মাঝগঙ্গার মাঝখানে দ্বীপের মধ্যে। সেখানে খবরের কাগজ নাই। জামালপুরে নেমে ওই দ্বিধার সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতেই একখানা খবরের কাগজ কিনে পড়তে বসল। বিষ্টু চক্রবর্তীর খবরের কাগজ পড়াও একটু বিচিত্র। প্রথম পৃষ্ঠার মোটা

হরপেব মাথাব খবরগুলোর উপব চোখ বুলিয়ে একটু হেসে নেয়। ছোট হরপেব বিশদ বিবরণ সে পড়ে না। বলে—কি পড়ব? লোকসভায় জলদগম্ভীর বক্তৃতা এবং তার উত্তর? জনগণের প্রতি নেতাদের উপদেশ? বিধানসভায় লম্ফ-ঝম্প?

এ সবেব গুপ্ত তথ্য বিষ্টু জানে। বলে—ওর আসল ব্যাপারটা কি জান? মামাতো পিসতুতো ভাইয়েব ঝগড়া। আপত্তি কর যদি তবে জাঠতুতো খুড়তুতো বলতে পাব।

যারা গদীতে ব'সে আছে তারা মামাতো বা জাঠতুতো, আব গদী পায় নি—যাদেব বল বিবোধী দল—তারা হ'ল পিসতুতো বা খুড়তুতো ভাইয়ের দল। জনগণেব নাম ক'বে যখন তুমুল ঝগড়া কবে ওরা, তখন বেচারা জনগণেবা হয় 'হরি'কে ডাকে, নয় সিনেমা দেখে। হয় গান করে—"হরিনামের গুণে গহন বনে মৃত তরু মুঞ্জরে"; নয়, হাতে তুড়ি দিয়ে গায়—"লারে লাপ্পা—লা, লাপ্পা লাপ্পা লাবে লাপ্পা লা।" রাবিশ!

প্রথম পাতাটা উল্টে গেল সে। দ্বিতীয় তৃতীয় পৃষ্ঠায় বিজ্ঞাপন আব সভাসমিতি, চাব পাঁচে সম্পাদকীয়। জোরালো ঘোরালো ঝালালো শানানো বানানো লেখা সব। এখানে কাগজে কাগজে পাল্লা। কে কত জোরালো ঘোরালো ঝালালো লিখতে পারে! এর মধ্যে রসকৌতুকের একটা স্তম্ভ আছে, সেটা সে পড়ে। তারপব পড়ে দুর্ঘটনাব খবর। মৃত্যুব খবরও সে পড়ে। বিয়ের খবর সে পড়ে না। রাবিশ! হয় বরের বাপ বড়লোক টাকাওয়ালা বা নামওয়ালা—নয় মেয়ের বাপ। ঠিক সেই কারণেই ছাপা হয় এই বিয়ের খবরগুলি। তারপর পড়ে আইন-আদালতের খবর। ওর মধ্যে পায় মানুষের পশুত্বের খবর। নিজের মতের সঙ্গে মিলিয়ে নেয়। দেখে হিসেব করে, অপরাধীর মধ্যে অশিক্ষিত লোক কত বেশী! বেছে বেছে সে সংবাদ নোট ক'রে রাখে, তর্কের সময় প্রমাণ-হিসেবে ব্যবহার করে।

চোখ বুলতে গিয়ে এমনি একটা খবর তার চোখে প'ড়ে গেল। বাড়ীর হিন্দুস্থানী ঠাকুর খাবারের সঙ্গে বিষ দিয়ে সর্বস্ব চুরির চেষ্টা করেছিল।

পাশাপাশি দুটি বাড়ীর ঠাকুর ষড়যন্ত্র ক'রে দুই বাড়ীর লোককে বিষ দিয়েছিল। একটি বাড়ীর গিন্নী রাত্রে কিছু খান নি, শরীর খারাপ ছিল ব'লে শেষরক্ষা হয়েছে। ব্যাপারটা ঘটেছে নতুন একটি কলোনিতে। মহিলাটি বলেন—রাত্রে একটা লরী পর্যন্ত এসেছিল। বোধ হয় মতলব ছিল ওই লরীতে বাক্স প্যাটরা বোঝাই ক'রে পালাবে। কিন্তু তার আগেই গোলমাল হওয়ায় লরীখানা মিনিট দুয়েকের জন্যে দাঁড়িয়ে লোকজনের জটলা দেখে জোরে গাড়ী হাঁকিয়ে চ'লে যায়। দুই বাড়ীর লোকজনকেই হাসপাতালে পাঠাতে হয়েছিল। একটা ঠাকুর ধরা পড়েছে দক্ষিণেশ্বরেব কালীবাড়ীতে, দিব্যি ছাই মেখে কপনি এঁটে ফোঁটা তিলক কেটে জাঁকিয়ে ব'সে ছিল সেখানে।

আর একটা খবর—জন কযেক একটা ট্যাক্সি ভাড়া ক'রে ব্যারাকপুরের দিকে গিয়ে পথে ড্রাইভারকে ছুরি মেরে তার টাকাকড়ি কেড়ে নিয়ে পালিয়েছে। .

নাঃ, আর না। থাক্ মুঙ্গের। হয় ফেরবার পথে—দিনে দিনে, অথবা এ যাত্রায় মুঙ্গের থেকেই গেল। সীতাকুণ্ডের জল খেয়ে হজমশক্তি বাড়িয়ে কি হবে এই আক্রাগণ্ডা এবং র‍্যাশানের বাজারে? থাক্ মুঙ্গের।

এর পর আর মুঙ্গের যাওয়া হতে পারে না। কাঁধের ভূতটা পায়ে পায়ে ছেঁদে তার দম বন্ধ ক'রে দিয়ে যেন খিলখিল ক'রে হাসছে। থাক্ মুঙ্গের।

সে চট্ ক'রে গিয়ে একখানা বক্তিয়ারপুরের টিকিট কিনে আনলে। চ'ড়ে বসল যে-গাড়ীখানায় সে এসে নেমেছিল সেই গাড়ীতেই। গাড়ীটা কিউলে যাবে দশটায়।

ওখানে গাড়ী বদল ক'রে বক্তিয়ারপুর। গাড়ী সঙ্গে সঙ্গেই। এখানা পৌঁছবে দশটায়, সেখানা পাশেই এসে দাঁড়াবে সোয়া দশটায়, ছাড়বে দশটা কুড়িতে। মোকামাতে ঘণ্টাখানেক থাকবে। তারপর ছেড়ে বক্তিয়ারপুরে ভোর ভোর পৌঁছবে। চমৎকার ব্যবস্থা। মোকামায় স্টেশনে ভাল রেস্তোরাঁ আছে। বিলিতি কায়দায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রস্তুত খাবার। জামালপুরেও পাওয়া যেত। কিন্তু এখানে আর সময় নাই।

নীল আলো জ্বেলে দিয়েছে। গার্ড সাহেব বাঁশী বাজালেই গাড়ী ছুটবে। সেলাম মুঙ্গের। বিষ্টু চক্রবর্তী তোমার ইতিহাস ভালবাসে ব'লে সে বেকুব নয়। রাত দুপুরে তোমার পথের উপর ঘুরে বেড়াতে পারবে না।

বিছানার বাণ্ডিলের উপর ঠেস দিয়ে একখানা রাগ মুড়ি দিয়ে ব'সে পড়ল সে। গাড়ীটা চলছে ঘটা ঘং ঘট্ ঘটাং শব্দ তুলে হেলে দুলে। ছেলেবেলায় ওই শব্দটাকে বিষ্টুরা বলত—শব্দটা বলছে, লাইন ছাড়লেই চিৎপটাং। ঘটা ঘং—ঘট্ ঘটাং।

বিষ্টু নিজেই নিজের তারিফ করলে—বুদ্ধি ছিল বটে। মিথ্যে তো বলে নি। লাইন ছাড়লেই চিৎপটাং তো বটে! আপন মনেই খুক্ খুক্ ক'রে হাসতে লাগল বিষ্টু।

লাইন ছাড়লেই চিৎ পটাং।

কি হ'ল?

হঠাৎ মাঠের মাঝখানে গাড়ীটা থেমে গেল যে! মরেছে রে! এর চেয়ে যে চিৎপটাং ভাল ছিল। গাড়ী লেট হলে যে—

—সিন্‌গল্ নেহি দিয়া বা:!

একজন দেহাতী যাত্রী ব'লে উঠল।

কা ভেলই?—আবার বললে।

—ভেলই তোমার মাথা!

সশব্দেই কথাটা ব'লে উঠেছিল বিষ্টু চক্রবর্তী। লোকটা শুনে তার দিকে তাকিয়ে হি-হি ক'রে হেসে উঠল।

—হামার মা—থা?—হি—হি—হি! হি—হি—হি! হামার মাথা তো হামরা কন্ধা পর হৈ বাবুজী! উ কৈসে ইঞ্জিনকে চাকাকে আগে যা কর রুখ দিয়া?

লোকটা বিষ্টুর কাছে এসে বসল। ব'সেই গান ধ'রে দিলে—

"রঘুপতি রাঘব রাজা রাম, পতিতপাবন সীতারাম।" গাড়ী কাহে রুখ গিয়া হায় সীতারাম, কৃপা কর গাড়ী ছোড় সীতাপতি রাম। "রঘুপতি রাঘব রাজা রাম, পতিতপাবন সীতারাম।"

বিষ্টু মনে মনে বললে—বানর যে মানুষের আদিপুরুষ তাতে আর সন্দেহ নাই। শিক্ষাতেই মনের বানরের লেজ খসে—বেঙাচির লেজের মত। তবে মধ্যে মধ্যে বানরে কৌতুক দিতে পারে, গাছের বানর নেচে দাঁত খিঁচিয়ে কৌতুক দেয়। এটা গান ধ'রে দিচ্ছে।

রামের কিন্তু কপাল বটে। এই শীতের রাতে মাঠের মাঝখানে সীতাপতিকে এসে গাড়ী ছাড়াতে হবে।

গাড়ীটা কিন্তু ছাড়ল সঙ্গে সঙ্গেই। সিটি বেজে উঠল, নড়ল। বানরটা জয়ধ্বনি দিয়ে উঠল—জয় সীয়ারাম!

বিষ্টুর ইচ্ছে হ'ল, লোকটার গালে ঠাস ক'রে একটা চড় কষিয়ে দেয়।

গাড়ীটা থেমেছিলই কিউলের আগের স্টেশনে, লক্ষীসরাইয়ে। লক্ষীসরাই ছেড়ে একটা মস্ত ব্রিজ পার হয়ে গাড়ীটা এসে কিউলে থামল।

—কুলি, কুলি! কু—লী—ই!

কোথায় কুলি? এদিকে ঘড়িতে বাজছে দশটা একুশ। মরেছে!

—হ বাবুজী! উতরাবে মাল? কুলি তো আভি নেহি বা। দুসরা গাড়ী ছোড়তা—হুঁয়া গয়া হোগা।

ইনি সেই সীতারামভক্ত সহযাত্রী।

—লেও, তাই উতারো।

মনে মনে বললে—একদিন গন্ধমাদন বহন করেছিস বিনামূল্যে। আমি মূল্য দেব, নে উতার।

—মগর সিরিফ উতারনেসে নেহি হোগা। মেন লাইনকে ট্রেন পাকাড়নে হোগা ভাইয়া।

*　　　*　　　*

মেন লাইনে ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে।

তব্? বাবুজী?—লোকটা বিষ্টুর মুখের দিকে তাকালে।

বিষ্টুর হাসি পেল। বলতে গেল—তব্ তুমহারা মাথা! তুই তো বেটা দায়ী এর জন্যে। তোর সীতাপতিকে গাড়ী ছাড়তে বললি, ছাড়লেও সীতাপতি; কিন্তু মিনিট পাঁচেক আগে হ'লে তো দুর্ভোগ ভুগতে হ'ত না!

দুর্ভোগ ব'লে দুর্ভোগ নয়, চরম দুর্ভোগ। মেন লাইনের পরের ট্রেন রাত্রি তিনটার পর। এখন সবে দশটা আটাশ। শীতের রাত্রি। কিউল জংশন প্রায় খোলা মাঠ। এই অল্পদূরে নদী। হু-হু ক'রে কনকনে জ'লো হাওয়া ব'য়ে যাচ্ছে। এখন যাই কোথায়? থার্ড ক্লাস ওয়েটিং-রুমকে এ দেশে বলে মুসাফেরখানা। মুসাফের শব্দটার একটা বিচিত্র অর্থ আছে। বললেই মনে হয়, পিতৃমাতৃহীন অনাথ বালকের মত যে সব পথিক বা যাত্রীব অবস্থা, তারাই মুসাফের। প্ল্যাটফর্মের পাশে মুসাফেরখানাটার ব্যবস্থাও ঠিক ওই রকম। চারিদিক-খোলা টিনের চালা একটা। এরই মধ্যে বাতাসের জলকণা ঠাণ্ডা টিনেব মাথায লেগে জল হয়ে টিনের নালী বেয়ে টপ্ টপ্ ক'রে ঝ'রে পডছে। বিষ্টুর আবার পিঠের দিকে একটা দুর্বল জায়গা আছে। দুবার নিউমোনিয়া হযেছিল, দুবারই 'প্যাচ' হয়েছিল ঠিক ওই জায়গায়।

মুসাফিরখানার চারিদিকটা একবার দেখে নিল সে। দুরন্ত শীত তাতে সন্দেহ নাই। এদেশের লোকগুলিও কাবু হয়ে গিয়েছে। যাত্রীর সংখ্যা বেশী নয়, পনের-কুড়ি জন, সবাই গায়ের মোটা চাদর বা র‍্যাপারের তলায় হাত পা গুটিয়ে যেন শামুকের খোলার মত পিঠে একটা খোলার সন্ধান করছে। থাকলে আজ বড ভাল হ'ত। একটা কনেস্টবল আছে পাহারায়—কম্বলের মত পুরু ওভারকোট গায়ে দিয়েও সে হি-হি ক'রে কাঁপছে। এখানে থাকলে তো জ'মে বরফ হয়ে যেতে হবে তাকে। না-হ'লে পিঠের সেই জায়গাটায় যে কাল একটা ব্যথা খচখচ করবে তাতে আর সন্দেহ নাই।

—বাবুজী?

—হাঁ।

—তব?

—সেই তো ভাবছি বাবা। তব? কাঁহা যায়েগা তব?

—চলিয়ে তব ধরমশালামে। আচ্ছা মোকাম। মজেমে রহিয়েগা। গরমসে—

—কত দূর ?

—এই নগিজ !

—তা' হ'লে মালগুলো নাও।

—কুলি! কুলি!

—তুমিই তো নামিয়েছিলে—তুমিই নাও না। পয়সা তুমিই নেবে।

—নেহি বাবু। ও তো আমার কাম নয়। তখন তুমি কুলি পাচ্ছিলে না, এক গাড়ীর মুসাফের, পথের মুসাফের যেমন একজনের গাঁটরী ভারী হ'লে অন্যজনে ব'য়ে দেয়—তাই দিয়েছিলাম। নইলে ও কাম—। ও আমার কাম নয়।

ব'লেই সে আবার ডাকলে—কুলি! এ—হো—ভাইয়া—

কুলি এল এবার। লোকটাকে দেখে একমুখ হেসে বললে—আ—হা! সিং—জী! কাহাঁ গিয়া থা? জামালপুর? দাদনকে তাগাদাকে লিয়ে?

—হাঁ—হাঁ। আব ইয়ে মাল তো লে লেও ভাইয়া। বাবুজীকে ধরমশালামে পৌঁছা দে। ব'লেই সে চ'লে গেল—নমস্তে বাবুজী!

বিষ্টু বিস্ময় বোধ করলে প্রথমটা।

কুলিটাই বললে—লোকটা এখানকার মহাজন। জাতে ছত্রি। মস্ত ক্ষেত খামার। তার উপর আছে দাদনের কারবার। কিউল থেকে জামালপুর পর্যন্ত রেলের কারখানার কুলীদের দাদন দেয়। কুলিটা বললে—বাবুজী, বিশ তিশ হাজারকে কারবার। বড়া ভারী মহাজন।

আর নাকি তেমনি ছাতি অর্থাৎ সাহস! এখানে আগে কাবুলী-ওয়ালারা মহাজনী করত। ডাণ্ডাসে তাদের ভাগিয়েছে। বাবুজী, উনকে পয়েরকে নাগরার আওয়াজে কিউলের লাটফরম থর থর ক'রে কাঁপে। একবার এক ফিরিঙ্গি সাহেব ওকে উল্লুক বলেছিল—সিংজী তার ঘাড়টা ধ'রে এইসা কিল পিঠে মেরেছিল কি অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। ডাকৃডর সাহেব বলেছিল—বুকে মারলে কলিজাটা ফট্‌সে ফাট্ যাতা!

তবে মেজাজ। মেজাজ ভাল থাকলে সিংজীর মত আদমী আর হয় না।

—বস্, ধরমশালা তো আগেয়া বাবুজী।

বিষ্টু মনে মনে সিংজীকে অজস্র ধন্যবাদ দিলে। চমৎকার, অন্তত শীতের দিনে চমৎকার আরামপ্রদ স্থান। চারিদিকে ঘেরা চক-মিলানো বাড়ী, মাঝখানে উঠান।

—দেখবেন বাবুজী কুঁইয়া আছে, ধাক্কা বচাকে।

সত্যই একেবারে কুয়োর উপরে চারিপাশের বেড়ার ধারেই এসে পড়েছিল বিষ্টু। ধরমশালাই বটে। একালে ষণ্ডরূপী ধর্মের নাকি মাত্র আধখানা পা। আর সাদা রঙ প্রায় কালো হয়ে এসেছে। ধরমশালারও সেই অবস্থা। প্রবেশপথে একটা অন্ধকার-প্রায় লণ্ঠন ঝুলানো, তারই আলোতে যেটুকু দেখবার ব্যবস্থা।

হুঁশিয়ার হয়ে বিষ্টু কুয়ো পার হয়ে এসে দাঁড়াল।

সামনে চারিপাশে টানা বারান্দা, ভিতরে সারি সারি ঘর। সব অন্ধকারে থমথম করছে। লোকজন দেখা যায় না। শুধু নাক ডাকার শব্দ শোনা যাচ্ছে। সে এক বিচিত্র কোরাস!

—ফো—ফো—ফোস্।

—ফর্‌র্—ফরাৎ।

—গোঁ—গোঁ—গোঁ।

—ঘোঁৎ—ঘোঁৎ—ঘড়র।

এরই মধ্যে একজন বু—বু ক'রে কাঁদছে।

কৌতুক বোধ করলে বিষ্টু। চমৎকার জায়গা। কুলীটি চারিদিক ঘুরে এসে বললে—বাইরেই আচ্ছা লিজিয়ে। কোন্ ঘরে মানুষ আছে, কোন্ ঘরে নাই মালুম হচ্ছে না।

সেই ভাল। ঘরের থেকে বারান্দা ভাল।

কুলিটা জিনিস নামিয়ে দিয়ে চ'লে গেল। ব'লে গেল ঠিক তিনটের সময় আসবে।

—বাবুজী!

অন্ধকারে চোখ তখন অভ্যস্ত হয়েছে বিষ্টুর। তবুও টর্চ জেলে দেখলে—

একজন প্রৌঢ়; নিতান্ত সাধারণ এ দেশের লোক, গায়ে একটা ময়লা চাদর, নির্বোধ মুখ, নির্বোধ দৃষ্টি, অপরিষ্কার ময়লা কাপড়, হাতে একটা ঝাঁটা। টর্চের আলো থেকে মুখ সরিয়ে নিয়ে বললে—আরে বাপ্।

—কোন্ হ্যায় তুম? কেয়া মাংতা?

—বিছানা তো বিছাইবেন বাবু! ঝাড়ু দিয়ে দিই!

এ আবার কে পরোপকারী?—হাঁ, বিছানা তো বিছাব, কিন্তু তুমি কে?

—আমি ধরমশালার নোকর। অপলোগনকে দাস।

দাস?—এই অবস্থায় একজন দাস মেলা অত্যন্ত সৌভাগ্যের কথা। বিষ্টুর তাতে আপত্তি ছিল না। কিন্তু দাস মহাশয় মনে মনে সিংহাসনপ্রার্থী নন তো! ইতিহাসে বহু দাস প্রভুকে হত্যা ক'রে সিংহাসন দখল করেছে। এবং পরিশেষে উপাধি নিয়েছে মালিক। মালিক কাফুর ছিল সম্রাট আলাউদ্দিন খিলজীর দাস। তবে এখন ঝাড়ু দিয়ে দিতে পারে দাস মহাশয়।

—তা দাও, ঝাড়ু দিয়ে দাও।

পরিপাটি ক'রে ঝাড়ু দিলে লোকটি। টর্চ জ্বেলে তাকে সাহায্য করলে বিষ্টু। সে রকম নিষ্ঠুর প্রভু নয়। তবে এ কথাও মনে মনে স্বীকার করলে যে, দাসের সঙ্গে তার তুলনাই হয় না। দাস বললে—এমন ক'রে ওই বিজলী আলোটা খরচ করছ বাবু, ও যে জলদি শেষ হয়ে যাবে। বহুৎ দাম ওর। তার থেকে বাতি জ্বাল। মোমবাতি!

বাতি আনতে ভুল হয়েছে বিষ্টুর।

দাস বললে—বল তো এনে দি।

—পাওয়া যাবে?

—জরুর। আমার কাছে মওজুদ রয়েছে। হুকুম করলেই এনে দি।

—বল কি? এমন ব্যবস্থা? ধরমশালা-প্রতিষ্ঠাতার পরলোকে জ্যোতির্ময় মণিকোঠায় স্থান হবে তাতে একবিন্দু সন্দেহ নাই অবশ্য। যদি পরলোক থাকে।

বুঝতে পারলে না দাস। নির্বোধের মত তাকিয়ে থেকে বললে—কটা আনব? একটা কি দুটো?

—দুটোই আন। দুটো পেলে একটা কে নেবে ?

দুটো আঙুলের মত সরু বাতি। নিজেই দেশলাই জ্বে'লে একটা ধরিয়ে বসিয়ে দিয়ে বললে—পয়সা কি এখন দেবেন ? না, পরে সব জুড়ে দিয়ে দেবেন যাবার সময় ?

—পয়সা ?

—হাঁ। বাতির দাম। এক একঠো চার চার পয়সা।

অবাক হয়ে গেল বিষ্টু।

দাস বললে—কি করব বাবুজী ? যাত্রীদের সুবিধার জন্ম আমি রাখি। কিন্তু যাত্রীরা বড একটা কেউ কেনে না। আঁধিয়ারাতে পাঁচ সাত ঘণ্টা কাটিয়ে দিয়ে চ'লে যায়। তাই দাম একটু বেশী না নিলে আমার পোষায় কি ক'রে বলুন!

বিনা বাক্যব্যয়ে দু আনা পয়সা বিষ্টু ফেলে দিলে।

দাস এবার বললে—বিছানাটা তা হ'লে বিছিয়ে দিই!

বিষ্টু রূঢ়ভাবে প্রশ্ন করলে—এর জন্মে কত লাগবে ?

দাস বললে—এর জন্মে আমার তো দাবী নাই হুজুর, যা দেবেন। বিছানা বিছিয়ে দিয়ে দাস বললে—তা হ'লে বাবু রাত্রে খাওয়া-দাওয়া করবেন তো ?

—তা করব। খিদেয় পেট জ্ব'লে যাচ্ছে বিষ্টুর। তার বালতীতে কিছু ফল আছে। দুটো নেবু, দুটো কলা। তাইতেই চ'লে যাবে।

দাস বললে—তা হ'লে তো পানি লাগবে বাবু। কুয়া থেকে জল তুলে দি ? আপনার বালতীটা নিই।

—উহুঁ। ওতে রাজ্যের জিনিস আছে।

—তবে আমার বালতী এনে দিই। রাত্রির মত রাখবেন, চার গো পয়সা দেবেন। লোটা তো আপনার আছে।

—আন, তাই আন।

কৌতুকরসবোধ এইবার উত্তপ্ত হয়ে ধ'রে ওঠবার উপক্রম হয়েছে। বালতীর ভাড়া চার পয়সা! একটা আনি সে ফেলে দিল।

হঠাৎ পিছনের দিকে ঘরের মধ্যে শিশুর কান্নার শব্দ পাওয়া গেল। ককিয়ে কেঁদে উঠেছে কার ছেলে! ভারী পায়ে বেরিয়ে এলেন এক শেঠ। বাতিটা তুলে নিয়ে বললেন—বাতিটা একবার নিলম মশা। বাচ্চাটা কান্‌ছে কেনো দেখি!

অন্ধকারের মধ্যে অবাক হয়ে ব'সে রইল বিষ্টু।

দাস জলের বালতী হাতে এসে দাঁড়াল।—বাবুজী!

—বল।

• —খানাপিনা কি হবে?

—সে আমার কাছে যা আছে তাতেই হবে।

—বলেন তো আমি টাটকা তাজা বানিয়ে দিতে পারি। আচ্ছা ভৈষা ঘিউ আছে। আঠা ভি আছে। আলু আছে, ফুলকবি আছে। পুরী তরকারী—ঝটসে আধ ঘণ্টাকে ভিতর—

বিষ্টু ভ্রূ কুঞ্চিত করলে। ঘাড়ের ভূতের মত পেটের ক্ষিধেও তার সংকল্পকে নাড়া দিচ্ছে।

—ভালা রাবড়ী আছে বাবুজী। হামারা ঘরমে ভৈষা আছে। হামি বনাইয়ে রাখি। উসব কাম ভি হামি আচ্ছাসে জানি।

রাবড়ীতে বিষ্টুর রুচি অনেকটা বিড়ালের মত। কিন্তু—। নাঃ, থাক্। খান ছয়েক পুরি বরং। নাঃ, আগে দেখি খিদে কতটা মেটে এগুলো খেয়ে!

সে হাঁকলে—শেঠজী, বাতিটা, বাতিটা দেবেন?

ঘর থেকে জবাব এল—আরে মশা বাচ্চাকে দুধ পিলাচ্ছে। থোড়া সবুর করেন।

পরক্ষণেই আবার বললেন—আওর একঠো বাতি আপনার পাশমে গিরা হুয়া দেখা। উঠো জ্বালেন। ই তো খতম হয়ে যাবি আভি!

অঙ্গ জ্ব'লে উঠল বিষ্টুর। সে বিষ্টু চক্রবর্তী। সে উঠে পড়ল।—আভি মাংতা হাম—হামারা বাতি।

শেঠজী চিৎকার ক'রে উঠল—জেনানা হ্যায়। জেনানা হ্যায়। মৎ আইয়ে।

কি বিপদ !

—কিসেব বিপদ ? হঠাৎ দবজাব ওপাশ থেকে পবিষ্কার বাংলায কলকাতাব ভাষায কেউ বললে—কিসেব বিপদ ? বাঙালীর বিপদ ? বাঙালীকে বাঙালী ছাড়া কে রক্ষা কববে এই দুর্দিনে ?

সঙ্গে সঙ্গে একটা জোবালো টর্চের আলো এসে পডল বিষ্টুর মুখের উপর —কি হযেছে মশায় ? দিল্লী থেকে আসছি। সর্বত্র—উত্তব ভাবতে সর্বত্র শুনে এলাম এক কথা। বাঙালী বলছে—কি বিপদ। পার্লামেণ্টে প্রশ্ন কবলে অন্য প্রদেশেব লোকেবা হাসে। কি হয়েছে বলুন তো ?

চমৎকাব স্যুট পরা এক বাঙালী ভদ্রলোক। চোখে চশমা। মুখে বুদ্ধিব দীপ্তি। হাতে একটা স্যুটকেস। বগলে একটা বিছানাব বাণ্ডিল। পাশে এসে বিছানা স্যুটকেস রেখে উত্তেজিত ভাবেই বললেন—কি হয়েছে ?

—কিছু না। একটা আধ-পোড়া বাতি নিয়েছেন এক মাড়োযাবী ভদ্রলোক—

—আপনার ? মাড়োযাবী নিয়েছে ?

—হ্যাঁ। সেটা চাইলাম, তা বলছেন—

—দেব না ?

—ঠিক তা নয়। বলছেন একটু পবে।

—কেন ? ছোয়াই ? তা নেবে কেন ? আপনি দিয়েছেন কেন বুঝি না। দিজ বুর্জোয়াজ—। এ—এই শেঠ !

ভদ্রলোক গট গট ক'রে ঘবে ঢুকে বাতিটা তুলে আনলে। সেটাব তখন প্রায় অন্তিম অবস্থা। এনে আব জ্বালা হ'ল না, ভদ্রলোকই আছাড ফেলে দিলে উঠানে। নিভে গেল সেটা।

বিষ্টু চক্রবর্তীব কিন্তু ভাল লাগল। লোকটি তাব নিজেব ধাতের লোক। তবে পলিটিক্যাল পার্টিব না হয়। সে আব একটা বাতি জ্বেলে বললে—বসুন।

—হুজুব।

—কে ? এখানে আবার হুজুর কে ? আমরা বাবা প্রলেটেরিয়েট কমরেড, হুজুর নই।

—আপনারাই আমার হুজুর বাবুজী।

—হুঁ! কিন্তু তুমি কে ?

এবার বিষ্টু হেসে বললে—ও আপনাদের দাস। ধরমশালার চাকর।

—হাঁ! কি চাই দাসজীর ?

—আপনার কোন কিছুর দরকার আছে কি না—

—কিচ্ছু না। আমার সব আমার সঙ্গে আছে। ভদ্রলোক ছোট বিছানাটি খুলে ফেললেন। বিছালেন বিষ্টুর বিছানার পাশেই। বিছাতে বিছাতেই বললেন—এ সব লটবহর আপনার ? সব ?

—হ্যাঁ, আমারই।

—যাবেন কোথায় ? কাশ্মীর ?

—নাঃ। তবে উত্তর ভারতটা ঘুরবার ইচ্ছে বটে।

—মোটে! তাতেই এত লটবহর ? আমার এই এতেই হোল ইণ্ডিয়া, অ্যাণ্ড—। চুপিচুপি কানের কাছে মুখ এনে বললেন—পাঁচ লাখ টাকার বিজিনেস ক'রে আসছি। তিন মাসের মধ্যে। শেয়ার, ইনসিওরেন্স এই। তবে টাকা অবিশ্যি সঙ্গে নেই। সে তো বুঝতেই পারেন।

হাসতে লাগলেন ভদ্রলোক।—আপনার ভ্রমণটা কিসের ?

—নিছক ভ্রমণ।

—নিছক ভ্রমণ ? মাই গড! ওয়েস্ট অব মনি! কোন ইনসিওরেন্সের এজেন্সী নিলেই তো হ'ত। চ্যারিয়ট সিয়িং প্ল্যান্টেন সেলিং দুই হ'ত। বুঝলেন তো রথ দেখা অ্যাণ্ড কলা বেচা।

—ওটা রুচির ব্যাপার।

—ঠিক। ঠিক। কিছু মনে করবেন না। আচ্ছা, আপনার লোটা নিতে পারি ?

—তা পারেন।

—থ্যাঙ্ক ইউ।

এবার অবসর পেয়ে বিষ্টু কমলা দুটো এবং কলা দুটো বের করল। একটা কলায় দাগ ধ'রে গেছে।

দাস দাঁড়িয়েই ছিল। সে বললে—বাবুজী! তা হ'লে কি হুকুম?

পেটে যেন আগুন জ্বলছে। বিষ্টু বললে—আমার চোখের সামনে যদি তৈরী ক'রে দাও তবে নিতে পারি।

—কি? ভদ্রলোক ঘুরে দাঁড়ালেন।

—খাবার। পুরি তরকারী তৈরী ক'রে দেবে। সামনে ব'সে তৈরী ক'রে নেব।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বিষ্টুর মুখের দিকে চেয়ে ভদ্রলোক বললেন—আর ইউ ম্যাড?

এমন ভাবে বললেন যে, মুখর বিষ্টু চক্রবর্তী বোবা হয়ে গেল, কেঁচো হয়ে গেল।

—এক রাত্রি না খেলে মানুষ মরে? ওয়েস্ট বেঙ্গলে কত লোক অনাহারে থাকে জানেন?

ভদ্রলোক হাত মুখ মুছতে মুছতে দাওয়া থেকে উঠে নিজের বিছানায় ব'সে স্যুটকেস খুললেন, বের করলেন একটা অ্যালুমিনিয়মের কৌটো, সেটা খুলে বললেন—আসুন।

গন্ধেই বিষ্টু চক্রবর্তীর রসনা জলসিক্ত হয়ে উঠেছিল। তবু সে বিষ্টু চক্রবর্তী। সে বললে—কিন্তু আপনাকে খাওয়াব কি ক'রে? এবং কোথায়?

—আই সি। অল রাইট, আমাকে—ঠিক আমাকে নয়, ওয়েস্ট বেঙ্গলের অনাহারক্লিষ্ট লোকের জন্য যা খুসী দিয়ে দেবেন এই কৌটোতে। একটা কুলুপ-দেওয়া কৌটো সে বের করলে।

একখানা দু টাকার নোট ফেলে দিলে বিষ্টু।

উপাদেয় খাদ্য। লুচি, আলু ও বেগুন ভাজা, কুমড়োর ছেঁচকি। খিদের মুখে অমৃত ব'লে মনে হ'ল।

খাওয়ার শেষে ভদ্রলোক বললেন—দাঁড়ান।

স্থটকেস থেকে একটা কাগজের বাক্স বের করলেন। তার থেকে একটা মিষ্টি বের ক'রে বিষ্টুর হাতে দিলেন—খেয়ে দেখুন তো! কেমন চিজ বলুন!

—চমৎকার, কিন্তু কেমন একটু—

—ফরেন, না? হাসতে লাগলেন ভদ্রলোক। একটি বিদেশী মহিলা এদেশী মিষ্টি তৈরী করতে শিখেছেন। তাঁর হাতের মিষ্টি। তিনি পাঠাচ্ছেন গুরু-দক্ষিণা। দিল্লী থেকে পাটনা। আমার স্ত্রীর কাছে। খরচ করতে বারণ ছিল, কিন্তু ব্রাহ্মণ-ভোজনের পুণ্যের লোভ ছাড়তে পারলাম না। এটার দাম কিন্তু আপনার কাছে নিই নি আমি।

সযত্নে বাক্সটি মুড়ে স্থটকেসে রেখে দিলেন ভদ্রলোক।

বিষ্টুর ভারী ভাল লাগল ভদ্রলোককে। চমৎকার লোক! এবার পরিপূর্ণ উদরে দুটো ঢেকুর তুলে পকেট থেকে সিগারেট বের ক'রে ভদ্রলোককে একটি দিয়ে নিজে একটি ধরালে।

—কি? গোল্ড ফ্লেক। গুড। আপনি মশাই পেটি বুর্জোয়া যাই বলুন। আমি ওদিকে প্রলেটেরিয়েট! কাঁইচি!

—আপনি পলিটিক্স্‌ও করেন বুঝি?

—রামঃ! ও সব তো ফাঁকির পলিটিক্স্! শুধু বক্তৃতা! আই বিলিভ ইন রেভোলিউশন। কাটাকাটি মারামারি—ভাঙা-চোরা হয়ে যাক একটা। সে যখন হবে না, তখন আমিও পলিটিক্স্ করব না। বা করি না। হ্যাঁ, তবে—রিলিফের জন্য চাঁদা তুলি। বাঙালীর বিপদেও মারামারি করি। এতে আছি। নিন,—আর বকাবকি নয়, গড়ান। আপনার তো আপ ট্রেন! সে তো তিনটে! আমার সাড়ে চারটে। এখন?

টর্চ জেলে হাতঘড়ি দেখলেন, বললেন—বারোটা বাজে।

•   •   •

হঠাৎ বিষ্টুর মনে হ'ল—অসহ্য যন্ত্রণা।

মনে হ'ল দুনিয়ার সব যেন ঘুরছে। পাক খাচ্ছে। তাকে মোচড়াচ্ছে, দুমড়াচ্ছে। তারপর যখন চোখ মেললে তখন সব যেন গোলমাল হয়ে

গেছে। তবু প্রখর দিনের আলো সে অনুভব করতে পারলে। মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা।

কিন্তু এ কোথায় সে?

—কি বাবুজী? এখন কেমন মালুম হচ্ছে?

—কে?

—চিনতে পারছেন না বাবুজী? বোকার মতই বললে—কুছ ডর নেহি। সব আচ্ছা হো যাবে।

—সিংজী?

—জী না। হম আপলোকের নোকর।

তাই তো, কে এ? সিংজী তো নয়! ময়লা কাপড়, নির্বোধ মুখ, নির্বোধ দৃষ্টি।

—বাবুজী! স্নেহার্দ্র সকরুণ কণ্ঠে সে ডাকলে। আচ্ছা মালুম হচ্ছে বাবুজী?

ওঃ, এই সেই ধরমশালার নোকর।

একজন কোটপ্যাণ্ট-পরা বাঙালী ভদ্রলোক ঘরে ঢুকলেন।

সেই বন্ধুটি? না তো! এঁর পকেটে স্টেথেসকোপ। ইনি তো ডাক্তার।

—বেশী কথা বলবেন না আপনি। আপনার বিশ্রাম প্রয়োজন।

—কিন্তু আমার কি হয়েছে?

—আপনার মনে পড়ে না কিছু?

—না। শুধু মনে পড়ছে—খেয়ে ঘুমিয়েছিলাম, তারই মধ্যে অসহ্য যন্ত্রণা—জ্বালা।

—হ্যাঁ। খাবারের সঙ্গে বিষ দিয়েছিল আপনাকে। এই ধরমশালার কীপার সময়ে না জানতে পারলে বিপদ হ'ত। সে স্কাউণ্ড্রেল কিন্তু পালিয়েছে। পালাক। কীপার আমাকে খুব সময়ে খবর দিয়েছিল। অবশ্য আমি কাছে থাকি।

বিষ্টু চক্রবর্তী কোমরে হাত দিলে। তার টাকা ছিল—যুদ্ধের আমলের কোমরবন্ধে বাঁধা। তার টাকা?

সেই নির্বোধ লোকটি বললে—সো ঠিক আছে। আমার পাশমে আছে।

নির্বোধ বললে—আঁধিয়ারামে উসকে পাকড়াতে সেকলাম না। আঁধিয়ারায় ঝট্‌সে ভাগলো। লেকেন উসকে চিজবিজ সব ছোড়কে ভাগা।

—আপনার মাকে টেলিগ্রাম ক'রে দিয়েছি। আপনার নোট বইয়ের ঠিকানা এবং নোট দেখে টেলিগ্রাম করেছি।

* * *

টাকা-পয়সা একটি কম পড়ে নাই।

থলেটি হাতে নিয়ে অবাক হয়েই ব'সে রইল বিষ্টু চক্রবর্তী। এই নির্বোধ সত্যই নির্বোধ। একটি পয়সা বকশিশ পর্যন্ত নিলে না। শুধু একটি হিসেব এনে ধরলে—টেলিগ্রাম খরচা, দাওয়াই খরচা, বাতির দাম, কেরোসিন তেলের দাম। অসুস্থতার সময় প্রথমে জ্বেলেছিল বাতি, তারপর হ্যারিকেন। ডাক্তারের ফি দিলে বিষ্টু নিজেই।

ঠিক এই সময় প্রবেশ করলে—সিংজী। সেই ট্রেনের সিংজী। এখানকার মহাজন। বড় ক্ষেত-খামারের মালিক। সেই কুলিটির কাছে বিষ্টুর বিপদের সংবাদ পেয়েছে। বললে—হায়—হায়—হায়! কসুর আমার। সেই রাত্রে তোমাকে ধরমশালা না দেখিয়ে দিয়ে আমার বাড়ী নিয়ে গেলাম না'কেন? তারপর নিজেই বললে—বাবুজী, তোমরা শহরের আদমী। আমাদের ঘুপচি দেহাতী ঘরে তোমাদের ভারী অশ্বস্তি হয়। তাই নিয়ে যাই নি। কিন্তু তা হ'লেও এ কসুর আমার—আমার।

দাস দুধ নিয়ে এল গরম ক'রে।—পিজীয়ে।

ডাক্তার বললে—খান।

বিষ্টুর মনে হ'ল—সে অমৃত পান করছে। চোখে জল আসছে। মনে হচ্ছে ওই জলে ধুয়ে পৃথিবীর রঙ বদলে যাচ্ছে। ময়লা কাপড় প'রে ওই নির্বোধ লোকটির বুকের ভিতর থেকে কে যেন উঁকি মারছে! দেবতা?

গবিন সিংয়ের ঘোড়া

গবিন সিং পশ্চিম দেশের ছত্রী—গোঁফ গালপাট্টা আর লম্বা লাঠি নিয়ে বাংলা দেশে চাকরি করতে এসেছিল। এসে এমনি লাগল ভাল দেশটা যে, এ দেশেই সে বাস ক'রে ফেললে। স্ত্রী-পুত্র নিয়ে এল, বাড়ী-ঘর করলে, সঙ্গে-সঙ্গে কিনলে এক ঘোড়া। ছত্রীদের ঘোড়া হ'ল ইজ্জৎ। আগেকার কালে ছত্রীদের ছিল প্রকাণ্ড বড় ঘোড়া আর তলোয়ার। এ-যুগে তলোয়ার গিয়েছে, লাঠি ধরতে হয়েছে। ঘোড়াটা আছে, কিন্তু বড় থেকে ছোট হয়ে এসেছে।

গবিন সিং বলত—নসীব। কপালে হাত দিত।

তারপর বলত—রংরেজ। ওই সাদা-চামড়া ফিরিঙ্গী রংরেজ।

লোকে হাসত।

গবিন সিং ছেলের নাম রেখেছিল নবীন। বাংলা দেশেই নবীনের জন্ম, তাই।

এ-দেশের বাপ-ছেলেতে, ভাইয়ে-ভাইয়ে নামের মিল রাখার রেওয়াজ-মতই নাম রেখেছিল। গবিনের ছেলে, নবীন। লোকে তার বুড়ো ঘোড়াটার নাম দিয়েছিল, প্রবীণ। গবিন হেসে ফেলত, বলত—ইয়ে বাংগালী লোক—আরেঃ বাপ! মগজ বহুৎ সাফা। এইসা ঝটসানি ছড়া বনা দেতা। হায় হায়!

প্রবীণ ছোট হ'লে কি হবে—গুণ অনেক। গবিনের অবস্থা বোঝে, ঘরে খায় না—চ'রে খায়, সকালবেলা ঘর থেকে বার হয়েই গাঁয়ের রাস্তা দিয়ে ক্ষুরে ক্ষুরে খপ্‌খপ্‌ শব্দ তুলে ছুটে বেরিয়ে যায়। সামনে লোকজন থাকলে নিজেই চিঁহি-হি ক'রে চেঁচিয়ে উঠে বলে—হট যাও। হট যাও।

লোকেরা বলে—ওই রে প্রবীণ আসছে।

তারা স'রে দাঁড়িয়ে পথ দেয়। বুড়ী বা বুড়ো পথে পড়লে প্রবীণ নিজেই পাশ কাটিয়ে চ'লে যায় বা থমকে দাঁড়ায়। তারা চ'লে গেলেই আবার ছুটতে আরম্ভ করে খপ্ খপ্ খপ্ খপ্। একেবারে গাঁ পেরিয়ে মজা-দীঘিটায় গিয়ে নামে। সেখানে ঘোড়াদাম-নামে ঘাস প্রচুর জন্মায়, তাই খায়। ঠিক সন্ধ্যের সময় ফিরে নিজের চালাটার সামনে দাঁড়িয়ে চিঁ-হি-চিঁ-হি শব্দ করে। শব্দ ক'রে সে ডাকে। কাউকে আসতেই হবে, হয় গবিনকে, নয় নবীনকে, নয় নবীনের মাকে, বলতে হবে—এসেছিস ?

প্রবীণ অমনি ঘাড়টা লম্বা ক'রে মুখটা কাছে নিয়ে আসবে, সেখানে কয়েকটা আদর ক'রে চাপড় মারতে হবে—বাস্। তা হ'লেই হ'ল। প্রবীণ খুশী হয়ে চালায় গিয়ে ঢুকবে। তা না-হ'লে কিছুতেই চালায় ঢুকবে না, চিঁ-হি-চিঁ-হি ডাকতেই থাকবে, তাতে বিরক্ত হ'লে বিপদ। চাবুকই মার আর চ্যালা-কাঠ দিয়েই পেটো, সে ডাকতেও থামবে না, ঘরেও ঢুকবে না, পালিয়েও যাবে না। ঠায় দাঁড়িয়ে থাকবে আর চেঁচাবে।

গবিন সিং মধ্যে-মধ্যে এ-গাঁয়ে ও-গাঁয়ে যায়। বাবুদের বাড়ীর চাকরি ছেড়ে সে এখন টাকা দাদনের ব্যবসা করে। চাষীদের টাকা ধার দেয়। দলিল না, খত না—শুধু-হাতে দেয়, আদায়ের সময় ঘোড়ায় চেপে গিয়ে বাঁ হাতে লাঠি ধ'রে ডান হাত পাতে—দাও টাকা। টাকায় মাসে দু'পয়সা সুদ, মাস-মাস সুদ চাই, মেয়াদ অন্তে টাকা চাই। আজ টাকাটা দিয়ে ফের কাল নাও তা দেবে, গবিন সিং কিন্তু কথার খেলাপ অর্থাৎ ঠিক দিনে টাকাটা না-পেলে সর্বনাশ। দিনগুলো গবিন সিংয়ের মুখস্থ থাকে। ঠিক দিনে সে ঠিক হাজির হবে। খেয়ে-দেয়ে সাদা চাদরের পাগড়ী বেঁধে, ছোট লাঠি হাতে তৈরি হয়ে নবীনকে বলে—নবীনোয়া, বোলাও তো পরবীণোয়াকো !

নবীন গাঁয়ের ধারে এসে হাঁকে বিচিত্র সুর ক'রে, আ—আ—আ—ওঃ !

প্রবীণ কান খাড়া ক'রে শুনে মজা দীঘি থেকে উঠে খপ্ খপ্ ক'রে ছুটে এসে নবীনের সামনে দাঁড়ায়। নবীন, প্রবীণের গলাটা ধ'রে পিঠে উঠে পড়ে, ঘাড়ের চুল মুঠোয় চেপে ধরে লাগামের মত। প্রবীণ সটান এসে ওঠে

বাড়ীতে। গবিন তার পিঠে কম্বল বেঁধে—মুখে লাগাম এঁটে চ'ড়ে বসে। প্রবীণ চলতে আরম্ভ করে ঠুক্-ঠুক্ ক'রে। এটুকুও প্রবীণের একটা গুণ। গবিন বলে—আরে মশা, পরবীণ সমুঝে সব। ভবতি-পেটমে দৌড়েগা তো হামারা তকলিফ হোগা।

লোকে বলে কিন্তু আসবার সময়? তখনও তো সেই ঠুক্-ঠুক্-ঠুক্!

—হাঁ-হাঁ। পাকিটমে টাকা থাকে, কাঁধমে তরকারি-উরকারি থাকে, ঝমঝমাবে নেহি। গির যাবে নেহি। পরবীণ সব সমুঝে মশা।

গাঁয়ের ছেলেরা গবিন সিংয়ের কথাকে সমর্থন করে। ওরা প্রবীণের তেজস্বিতার সঙ্গে খুব পরিচিত। মধ্যে মধ্যে ওরা দল বেঁধে দীঘির ধারে যায় প্রবীণের পিঠে চ'ড়ে তেপান্তরের মাঠে ছুট দেবার জন্য। ওদের দীঘির পাড়ে দেখলেই প্রবীণ ঘাড় উঁচু ক'রে দাঁত বের ক'রে শুরু করে—চিঁহি-চিঁহি-চিঁহি।

ছেলেরা কিন্তু ওতে ভয় পায় না। ওরা তাড়া দিতে থাকে। প্রবীণ কামড়াতে আসে। ওরা খুব চতুর, দূর থেকে বিচিত্র কৌশলে নানাদিক থেকে ওকে বিভ্রান্ত ক'রে মাথার চুলে এবং কানে চেপে ধ'রে দড়ি দিয়ে বাঁধে। তারপর তারা পালা ক'রে চাপে। চাপা-মাত্র প্রবীণ সামনের জোড়া-পা তুলবে, তাতে সওয়ার না পড়লে প্রবীণ পিছনের পা ছুঁড়বে, আবার সামনের পা তুলে দাঁড়াবে। শেষ পর্যন্ত ছুটবে—ছুটে গিয়ে গাছের গুড়িতে গা ঘেঁষে দাঁড়াবে অর্থাৎ সওয়ারের পা-খানাকে টিপে ধরবে গাছ ও নিজের পেটের সঙ্গে। সওয়ার পড়লেই সে তখন প্রচণ্ড বেগে ছুটবে প্রান্তরের মধ্যে। চক্রাকারে সার্কাসের ঘোড়ার মত ছুটবে। ছেলেরাও ছোটে তাকে আবার ধরবার জন্য।

কিন্তু এ মজা-দীঘির ঘাসে-ভরা কাদামাটি নয়, শক্ত মাটির ডাঙা, এখানে প্রচণ্ড বেগে দৌড়োয় প্রবীণ। ছেলেরা ক্লান্ত না-হওয়া পর্যন্ত থামে না। ছেলেরা ক্লান্ত হয়ে বসলে সে দাঁড়ায়, চিঁহি-চিঁহি ক'রে—সম্ভবত ওদের মুখ ভেঙচে আবার চ'লে যায় দীঘির দিকে।

ছেলেরা বলে—তীব্রবেগে দৌড়ুতে পারে প্রবীণ। কিন্তু ভারী পাজী।

কলকাতার ঘোড়দৌড়ের কথা শুনেছে তারা। তারা বলে—যা ছোটে কলকাতার ঘোড়দৌড়ে প্রবীণ ফাষ্টো হতে পারে।

কিন্তু কে চাপবে? গবিন সিংয়ের পেট কব্ কব্ করে, সে চড়লে প্রবীণকে আস্তে হাঁটতে হবে। ছেলেরা চাপলে—সামনের পা তুলবে, পেছনের পা ছুঁড়বে, দেওয়াল ঘেঁষে সওয়ারকে ঘেঁষটে দেবে। ততক্ষণে বাকি ঘোড়ারা মেরে দেবে বাজি।

এক পারে নবীন। নবীন শুধু পিঠের উপর ঘাড়ের চুলের মুঠোটি ধরলেই প্রবীণ ছুটবে—যেন পক্ষীরাজ।

ছেলেবয়সে নবীন পুলকিত হ'ত। কিন্তু ক্রমশ বয়স বাড়ার সঙ্গে সে লজ্জিত হতে আরম্ভ করলে। তার বাপ তাকে পরবীণোয়াকে বোলাইতে বললে সে বলত—আমি পারব না।

বাপ বলত—কাহে?

ছেলে বলত—না। পেটমোটা একটা বিশ্রী ঘোড়া।

—পেটমোট্টা। বিস্মিত হ'ত গবিন সিং। কি হ'ল তাতে? সে বলত—পেটমোট্টা তো কি হইয়েছে? ইয়ে তো দেশকে দস্তুর। বাংগালকে পানিমে পেটমোট্টো হোতা হায়। পিলিহা রে বেটা, পিলিহা। সব লোকের পেটমে পিলিহা—পরবীণকে পেটমে ভি পিলিহা—কেয়া হুয়া উস্‌মে?

নবীন রাগ ক'রে বেরিয়ে যেত। গবিন সিং অগত্যাই নিজে গিয়ে হাঁকত—আঃ—আঃ—আঃ—ও—

পরবীণ এসে হাজির হ'ত, কিন্তু মন্থরগতিতে। নবীনের হাঁকে যেমন ছুটে আসত—তেমন ছুটে আসত না।

সেই প্রবীণ সেদিন মরল।

গোটা গ্রামটায় হৈ-হৈ প'ড়ে গেল। কথাটা অবশ্য আশ্চর্যের কথা। একটা ঘোড়ার মৃত্যুতে হৈ-হৈ পড়ে কোন্ কালে? পড়ে না, কিন্তু প্রবীণ

যে আত্মহত্যা করলে। এও অবশ্য অবিশ্বাস্য কথা, কিন্তু লোকে বললে তাই। পৃথিবীর লোকে অবিশ্বাস করুক, গাঁয়ের লোকের দৃঢ় বিশ্বাস—প্রবীণ আত্মহত্যা করেছে। গ্রামের ধারে ছোট নদীটার উপর যে খুব উঁচু সাঁকোটা আছে, সেইখান থেকে ঝাঁপ খেয়ে নীচে প'ড়ে ঘাড় ভেঙে মরল প্রবীণ।

আগাগোড়াই তো সব তারা জানে—চোখে দেখলে।

নবীন অনেকদিন থেকেই প্রবীণের পেটের পিলের জন্য লজ্জিত ছিল। সে লজ্জা তার শতগুণ বেড়ে উঠেছিল বিয়ের পর। কোশ-চারেক দূরে কামৎপুর-পুণ্যার ছত্রীদের বাড়ীতে নবীনের বিয়ে হ'ল। প্রবীণের পিঠে চেপে শ্বশুরবাড়ী যেতে হ'ল তাকে বাধ্য হয়ে বাপের তাড়ায়। প্রবীণকে দেখে নবীনের শালারা আর ঠাট্টার সীমা-পরিসীমা রাখলে না। নবীন, এটা চিঁ-হি ক'রে ডাকে, না, হুঁকো-হুঁকো ক'রে ডাকে হে?

নবীন লজ্জা সত্ত্বেও বললে—একবার চেপে দেখ না কেমন শিরপা ক'রে লাফিয়ে ওঠে!

তার কথাটা শেষ হতে না-হতে কামাৎপুরের ছত্রীদের তিন-মণি-ওজনের পরশুরাম সিংজী দাওয়ার উপর থেকে ঝপ্ ক'রে প্রায় ঝাঁপিয়ে আচম্কা প্রবীণের পিঠে চেপে বসল। সঙ্গে-সঙ্গে কোঁক ক'রে একটা শব্দ ক'রে প্রবীণ পেছনের পা দুটো দুমড়ে ব'সে গেল।

সকলে হো-হো ক'রে হেসে উঠল। নবীনের মাথাটা যেন কাটা গেল। ঠিক এই সময়ে নিজেদের ঘোড়ায় চেপে গ্রামান্তর থেকে উপস্থিত হ'ল তার বড় শালা।

পুণ্যার ছত্রীদের ঘোড়াটা মস্ত বড়। নির্লজ্জ প্রবীণ সেটাকে দেখে ক্ষেপে উঠল। চীৎকার ক'রে সামনের পা তুলে সে তাকে আক্রমণ করলে। বড় ঘোড়াটা বোধ হয় তুচ্ছ ক'রেই তার পানে পেছন ফিরে দাঁড়াল—অত্যন্ত ক্ষিপ্রভাবে দাঁড়িয়ে ঝেড়ে দিলে পেছনের জোড়া-পায়ের লাথি। বাস্!

প্রবীণের হুঙ্কারের আধখানা তার মুখেই থেকে গেল—সে চিৎ হয়ে উল্টে প'ড়ে গেল মাটিতে।

প্রবীণ কাওরাল কি না নবীন তা বুঝতে পারল না, কামৎপুরের ছত্রীদের সেই হা-হা ক'রে হাসিতে আকাশ তখন ফেটে যাচ্ছে। নবীন শুধু দেখতে পেলে, প্রবীণের নাক থেকে দরদর ক'রে রক্ত পড়ছে।

রাত্রে স্ত্রী বললে—তুমি ওই ছাগলটায় চেপে আর এসো না।

নবীন মনে-মনে ভীষণ প্রতিজ্ঞা করলে। আসবার সময় ঘোড়াটায় চাপলে না। লাগামের দড়ি ধ'রে টেনে হেঁটেই ফিরল।

শালারা বললে—আ-হো সওয়ার, ই কেয়া বাত? চড়ো—তোমার পক্ষীরাজে চড়ো!

নবীন বললে—বড় ঘোড়া কিনে তবে চ'ড়ে আসব।

প্রবীণ কিন্তু দড়ির টানে চলবে না, সে ঘাড় টেনে দাঁড়িয়ে গেল। সওয়ার না হ'লে সে যেতে নারাজ। বারকয়েক চিঁহি-চিঁহি ক'রে বললে—চড়ো চড়ো। নাকে আমার চোট লেগেছে, ও কিছুই না। চড়ো তুমি।

নবীন চাবুকের বাঁটটা দিয়ে তাকে পিটতে শুরু করলে। পিছন থেকে পিটতে পিটতে তাকে চার কোশ পথ ছুটিয়ে নিজেও ছুটতে ছুটতে এল। বাড়ীতে পৌঁছে বাপের সামনে চাবুকটা আছড়ে ফেলে দিয়ে বললে—অকিঞ্চন ধোবার বাড়ী চললাম আমি।

—ধোবার বাড়ী? আভি? কাহে?

—তোমার প্রবীণকে আজ বেচব আমি।

গবিন সিং হুঙ্কার দিয়ে উঠল—তুম্‌কো-ভি হম্‌ বেচেঙ্গে। বুলাকি মেহথরকো পাশ বেচ্‌ দেঙ্গে।

নবীন থমকে দাঁড়াল এবার। বললে—বেশ, তোমার বাড়ী থেকে চললাম আমি।

গবিন বললে—আভি, আভি, অভি নিক্‌লো।

প্রবীণের ক্ষতবিক্ষত দেহে সে হাত বুলোতে লাগল।

নবীন আলাদা হয়েই গেল। গবিন সিং তাতে দুঃখ করলে না। মরদের লড়কা মরদ, দুনিয়াতে মরদে আপন কিস্মতে অর্থাৎ

শক্তিতে ক'রে খায়, বাপের রোজগারে যে খায় তার আর মরদানি কোথায়?

নবীন সত্যি মরদ। সে বেশ রোজগার শুরু ক'রে দিলে। হাটে-হাটে গ্রামে-গ্রামে সে ধান চাল কেনা-বেচার কারবার আরম্ভ করলে। বছর দুয়েক পরে একদিন সে তার শালার সেই বড় ঘোড়াটায় চেপে বাড়ী এল। পুরনো বাড়ীতে। বাপের বাড়ীতে এসে বললে—কিনলাম এটা।

গবিনের মুখ গম্ভীর হ'ল। নবীনের শালাদের দেনা হয়েছে সে জানত, নিজেও কিছু টাকা পেত; টাকাটা অবশ্য এবার সে পাবে—কিন্তু নবীন এইভাবে টাকাটা নষ্ট করলে এটা তার ভাল লাগল না। বড় ঘোড়া—তার ছোলা চাই, জৈ চাই, দলাই-মলাই চাই। মনে হ'ল তার প্রবীণের কথা। লক্ষী—প্রবীণ তার লক্ষী।

নবীন বললে—তোমার আস্তাবলে ঘোড়াটা এখন থাকবে। ওই গাধাটা থাকবে বাইরে এখন।

গবিন বললে—কেয়া করু? নাচার! তুম লে-আয়া রূপেয়াকে মাল—

নবীন চালায় ঘোড়া বাঁধলে, দানা দিলে, পেছনের দিকে দুটো খোঁটা পুঁতলে, পা টেনে দড়ি দিয়ে খোঁটার সঙ্গে বাঁধলে। প্রবীণের এসব দরকারও ছিল না, খোঁটাও ছিল না।

সন্ধ্যেবেলা নবীন স্ত্রীকে বললে—দেখ, পায়ে হেঁটে তোমার ভাইরা এখন থেকে আসবে এখানে—সেটা আমারই লজ্জা হবে। একটা কাজ করলে হয় না?

স্ত্রী মুখের দিকে চাইলে—কি কাজ?

—প্রবীণকে তোমার ভাইদের দিয়ে দি। কি বল? ঘোড়া তো। ছাগল তো নয়। আর ছাগল যদিই হয়, তাতেই বা কি? পায়ে হাঁটার চেয়ে ভাল তো।

স্ত্রীর সঙ্গে একটা ঝগড়া বেধে যেত। কিন্তু তার পূর্বেই চিঁহি-চিঁহি চীৎকারে গোটা পাড়াটা একেবারে চকিয়ে গেল।

নবীন লাফিয়ে উঠল—গেল, প্রবীণ গেল। আজ আবার—

ছুটে গেল সে। গিয়ে যা দেখলে, তাতে তার চক্ষু স্থির হয়ে গেল। প্রবীণ যায় নি, যেতে বসেছে বড় ঘোড়াটাই। আজ তার পেছনের পায়ে বাঁধা রয়েছে সে। সামনে গলায় বাঁধন। প্রবীণ দীঘি থেকে ফিরে তার আস্তাবলে সেই পুরনো দুশমনকে দেখে ক্ষেপে গিয়ে তাকে আক্রমণ করেছে। বন্ধনদশার সুযোগ নিয়ে সে সামনের পা দুটো তার পিঠে চাপিয়ে কামড়ে ধরেছে তার ঘাড়। গবিন সিং তাকে পিটছে, বলছে—ছাড়্ ছাড়্! তবু সে ছাড়ছে না।

নবীন প্রকাণ্ড এক লাঠি এনে পিটিয়ে তাকে ছাড়লে। প্রবীণ বড ঘোড়াটার ঘাড়টার খানিকটা মাংস খুলে নিয়েছে কঠিন আক্রোশে। নবীন বললে—ওকে আমি মেরে ফেলব।

গবিন আজ আর প্রবীণের পক্ষ নিতে পারলে না। এমন ঘোড়া, এত টাকা দাম—তাকে জখম ক'রে দিলে প্রবীণ? সে বিনয় ক'রে বুঝিয়ে বললে—গোস্সা মৎ করো বেটা। ভালা হো যায়েগা। ঘোড়া সে হলদি—

নবীন কোনো কথা না ব'লে তার ঘোড়াটাকে খুলে নিয়ে চ'লে গেল।

প্রবীণ ঠুক্ঠুক্ ক'রে তার আস্তাবলে গিয়ে ঢুকল।

গবিন সিং মারা গেল মাস-দুয়েক পর। হঠাৎ হার্টফেল ক'রে মারা গেল। নবীন বাড়ীতে ফিরল না, এ বাড়ীতে সে ধান-চালের গুদাম করবে, পাশাপাশি বাড়ি, নিজের নতুন বাড়ীতে নিয়ে গেল তার মাকে। শুধু আস্তাবলের চালাটা ভেঙে দিলে।

প্রবীণ সন্ধ্যায় এল, এসে সেই খোলা-চালাতেই গিয়ে দাঁড়াল।

নবীন ওকে খুব ঘা-কতক দিয়ে তাড়িয়ে দিলে। কিন্তু সকালে উঠে দেখলে, প্রবীণ ঠিক সেইখানে দাঁড়িয়ে আছে। সে আবার উঠল লাঠি নিয়ে। স্ত্রী বাধা দিয়ে বললে—মারছ কেন?

—আপদকে দূর করব আমি।

—না।

—তবে ওকে বেচে দোব আমি। আজই বেচে দেব।

—না।

—না তো ওকে কি করব আমি?

—ধান-চালের ছালা চাপিয়ে হাটে যাবে-আসবে। গরুর গাড়ী ভাড়া লাগবে না।

ঠিক। ঠিক।—খুব খুশী হলো নবীন।

বাপের শ্রাদ্ধ হয়ে গেলে—নবীন সেদিন হাটে বের হ'ল। ধান-চাল বেশি কিছু জ'মে ছিল, ছালায ভর্তি ক'রে প্রবীণের পিঠে চাপিয়ে দিল। নিজের বড় ঘোড়ায় সওযার হয়ে কারবারের মজুরটাকে বললে—ওটাব দড়ি ধ'বে টেনে নিয়ে চল্।

নিজে সে রওনা হ'ল। বড় ঘোড়াটা টগ্‌বগ্ ক'রে বেরিয়ে গেল।

খানিকটা এসেই পেছনে শব্দ শুনে সে চমকে উঠল। চিঁ-হি চিঁ-হি। ফিবে তাকিযে দেখলে—প্রবীণ ছালার বোঝা পিঠে নিযে তীরবেগে ছুটে আসছে। চীৎকার করছে, হিংস্র-আক্রোশে দাঁত বেরিযে পড়েছে। যে লোকটা দড়ি ধ'রে আনছিল তাব কোনো চিহ্ন নেই। প্রবীণ তাব হাতের দড়ি ছিঁড়ে পাগলেব মত ছুটে আসছে। নবীনেব ঘোড়াও চঞ্চল হয়ে উঠল। সেও ডাকতে শুরু ক'বে দিলে। নবীন বাশ টেনে তাকে বাগ মানাতে গেল। প্রবীণ এসে সামনেব পা তুলে দাঁত বের ক'রে আক্রমণ করতে চেষ্টা করলে। নবীন জিনেব পাশে যে লাঠিটা বাঁধা ছিল সেটা খুলে নিলে। লাঠিটা সাংঘাতিক লাঠি, মাথায ছুঁচোলো একটা ফলা আছে—হঠাৎ চোখে পড়ে না। কিন্তু আক্রমণের সময় বেশ বল্লমের মত ব্যবহার করা যায়। কিন্তু তার আগেই তাব বড ঘোড়াটা ছুটতে শুরু কবলে—ভয়ে ছুটতে শুরু করলে। প্রবীণ খোলা। সে সওয়াবের হাতে বাঁধা। তাব উপর প্রবীণের দাঁতগুলোর বড় ধার, সে কথা তার মনে আছে। নবীন বাশ টানলে—তবু সে মানবে না। ওদিকে প্রবীণও ছুটছে। প্রাণপণে ছুটছে। মোটা পেটটা যেন দৌড়ের লম্বা পা ফেলাব টানে সরু হয়ে যাচ্ছে। ঘোড়-দৌড়ে বাজি জেতবার জন্যই যেন সে ছুটছে। পিঠের ছালার বাঁধন খুলে ধান-চাল পড়ছে। প্রবীণ ছুটছে—ছুটছে—ছুটছে। দেখতে দেখতে

সে এগিয়ে গেল। নবীনের ঘোড়াটা এবার থামতে চেষ্টা করলে। কিন্তু নবীন এবার তাকে ছোটালে। হাতে নিলে সেই লাঠিটা।

দুটো ঘোড়া ছুটছে।

প্রবীণ প্রাণপণে ছুটছে। এমন ছোটা তার কেউ কোনদিন দেখে নি। সেও জীবনে কোনদিন এমন ছোটা ছোটে নি।

রাস্তার লোকে দেখছে। হাততালি দিচ্ছে। কে জেতে? কে জেতে?

বলিহারি—বাহবা—প্রবীণোয়া! বাহবা—বাহবা!

সামনেই সাঁকোটা বাজি-জেতার চিহ্নিত স্থানের মত দাঁড়িয়ে আছে।

বলিহারি প্রবীণোয়া! বলিহারি!

প্রবীণই পৌঁছুল সেখানে বড় ঘোড়ার আগে।

বাস্। আর তার জীবনের কি প্রয়োজন? উচু সাঁকোটার পাশের রেলিং অনেক দিন ভেঙেছে। ডিস্ট্রিক্টবোর্ড মেরামত করায় নি। বিশ হাত নীচে নুড়ি-পাথর-ভরা নদীর গর্ভ। প্রবীণ সেইখান দিয়ে খেলে ঝাঁপ।

নবীন সজোরে টেনে ধরলে তার ঘোড়ার লাগাম।

ঘোড়াটার ঠোঁট কেটে রক্তাক্ত হয়ে গেল। সে থামল। নবীন ঘোড়া থেকে নেমে কপালের ঘাম মুছে বললে—শয়তান! গাধা!

লোকে চোখে দেখলে—প্রবীণ বাজি জিতে ইচ্ছে ক'রে লাফিয়ে পড়ল সাঁকো থেকে।

প্রবীণের মৃতদেহও তারা দেখতে গেল নদীর বুকে নেমে। ঘাড় গুঁজে পড়েছে বেচারী। ভেঙে গেছে ঘাড়টা।

কিন্তু ওর পেছনে পায়ের ওপরে এগুলি কি? অনেকগুলি রক্তাক্ত ক্ষতচিহ্ন?

আফজল খেলোয়াড়ী ও রমজান শের আলি

মাসিকপত্রের সম্পাদক যাঁরা, তাঁরা টাকাপয়সা বেশী পান না বটে, কিন্তু খাতির পান অনেক। একটা কথা আছে, খাতিরে পেট ভরে না; কিন্তু সম্পাদকের বেলা কথাটা পুরো সত্যি নয়। আমি নিজে একজন সম্পাদক, সেই হিসেবে এ-কথাটা হলপ ক'রে বলতে পারি। পেট ভ'রে খাওয়া এবং যাকে রীতিমত রাজভোগ বলে তাই খাওয়া, মাসে-দু'মাসে একটা জোটে। আর, মাঝারি খাওয়া—এ ধ'রে রাখুন, মাসে আট-দশটা। অর্থাৎ, শনিবার রবিবার দুদিন দুটো মিটিংয়ে সভাপতিত্ব করলে মাসে আটটা, আর মাঝ-সপ্তাহে দুটো, একুনে—দশটা সভা। এতে ফুলের মালা তার সঙ্গে কিঞ্চিৎ জলযোগের নামে বেশ মাঝারি অর্থাৎ গুড সেকেণ্ড ক্লাস খাবার মেলে। আর, রীতিমত রাজভোগ—সে মেলে, রাজা-জমিদার লেখকদের বাড়ীতে। তাঁরা নিমন্ত্রণ ক'রে, গাড়ী পাঠিয়ে নিয়ে যান এবং খাতির ক'রে দাঁড়িয়ে থেকে খাওয়ান। এঁরা বেশীর ভাগ লিখে থাকেন ভ্রমণ-কাহিনী আর শিকার-কাহিনী। প্রচুর টাকা আছে, দেশভ্রমণ করেন, ভ্রমণ-কাহিনী লেখেন, মেলা পিকচার পোস্টকার্ড, ফোটো কিনে আনেন, সচিত্র ভ্রমণ-কাহিনী ছাপা হয়, মধ্যে-মধ্যে নিজের ছবিও তার মধ্যে থাকে, নীচে লেখা থাকে—লেখক। আর, শিকার-কাহিনীর মধ্যে মরা-শিকারের মাথায় বা বুকে পা দিয়ে, বন্দুক-হাতে শিকারীর ছবি ছাপা হয়। এতে কাগজের লাভ হয়। সংসারে বাঘ মারতে কে না ভালোবাসে? যে হাতে-বন্দুকে পারে না, সে মুখে মারে। বাঘ-মারার কাহিনী এলেই আমরা ছাপি। এতে আরও একটা সুবিধে, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই লেখার জন্যে টাকা লাগে না। উল্টে নেমন্তন্ন খাওয়া যায়। আমরা নেমন্তন্ন খাই আর হাসি—হাসি আর নেমন্তন্ন খাই। অবিশ্যি দু-একজন শিকারী আছেন বা ছিলেন—যেমন ধরুন, কে. এন. চৌধুরী; যেমন আছেন হীরালাল দাশগুপ্ত; প্রাতঃস্মরণীয়

লালগোলা-রাজবংশের সাহিত্যিক এবং শিকারপ্রিয় রাও রাজা ধীরেন্দ্রনারায়ণ —যাঁদের সত্যই শ্রদ্ধা করি, এবং এঁদের শিকারকে ঠিক জানোয়ার-মারার খেলা হিসেবে দেখি না। আরও কিছু যেন হিসেবে মেলে, তাঁদের কথা আমি এঁদের সঙ্গে ধরছি না। এমনি ধরনের মক্কেল দু-একজন আমার আছে মশাই, সে কথা গোপনে চুপি-চুপি আপনার কাছে বলছি, আপনি যেন প্রকাশ করবেন না। করলে অবশ্য আপনিই ঠকবেন, কারণ আমার কাগজে তাঁর শিকার-কাহিনী কি ভ্রমণ-কাহিনী আমি কখনও প্রকাশ করি নি, অন্য কাগজে প্রকাশ করিয়ে দিয়েছি। কথাটা প্রকাশ ক'রে দিলে কিন্তু একটা ক্ষতি হবে আমার, প্রতি বছর দুবার—একবার বড়দিনে, একবার ভাদ্র মাসে একটা বড় রুই আর গোটাকয়েক বাগবাজারী ইলিশ আমি পাই মশাই, ওটা আর পাব না।

যাক্, যার জন্য এত বড় ভুমিকাটা করা গেল, সেই কথাটি বলি। শিকার-কাহিনীটি হাতে নিয়ে ব'সে আছি। অনেক কথা মনে পড়ছে। এইমাত্র হাতে দিয়ে গেলেন শিকারী মহাশয়। ব'লে গেলেন, আমাদের দেশের লোক তিনি। বেশ মোটাসোটা নাদুস-নুদুস চেহারা, হাঁড়ির মত মুখ, ফোলা-ফোলা গাল, তাতে আবার গোটাচারেক পান পোরা আছে। কষ বেয়ে পানের রসও একটু-একটু গড়িয়ে পড়ছে।

যাক্, একেবারে গোড়া থেকেই বলি।

আপিসে ব'সে আছি, প্রুফ দেখছি, হঠাৎ বাইরে একখানা গাড়ী এসে দাঁড়াল। জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখলাম, ঐ চেহারার একটি লোক নামল। গাড়ীর মধ্যে সদ্য-ট্যান-করা একটা চিতে বাঘের চামড়া। মাথাটায় খড়-টড় পুরে ঠিক আস্ত এবং জ্যান্ত বাঘের মাথা বানিয়ে দিয়েছে। খোলা দরজার মধ্য দিয়ে দেখি—একটা চকচকে রাইফেল; ওটাও যে সদ্য-কেনা তাতে সন্দেহ রইল না। বুঝলাম, বড় মক্কেল এসেছে। শিকার-কাহিনী—সচিত্র নিশ্চয়! জামা-কাপড়গুলো একটু সাজিয়ে-গুছিয়ে নিয়ে বসলাম।

কিন্তু কি হ'ল? শিকারী আসছেন কই? কি ব্যাপার? তা হ'লে আমার এখানে নয় নাকি? জানলা দিয়েই ভাল ক'রে উঁকি মারলাম।

হ্’, আমার এখানেই তো বটে। হাতে সদ্য-প্রিন্ট-করা ফোটোর খাম, একখানা এক্সারসাইজ বুক। কিন্তু ভদ্রলোক বাইরের দরজার মুখে এক-একবার আসছেন, আবার সঙ্গে-সঙ্গেই প্রায় ছুটে পালিয়ে যাচ্ছেন কেন? দস্তুরমত ভীত হয়েছেন যেন। হঠাৎ এই সময় চোখাচোখি হয়ে গেল তাঁর সঙ্গে।

তিনি ব’লে উঠলেন, মশাই! দয়া ক’রে যদি ওই ওটাকে একটু সরান।

—কি? কাকে? কোন্‌টাকে?

—এই আপনাদের ছাগল-ছানাটাকে। বড্ড লাফাচ্ছে।

একটা মাস-দুয়েক বয়সের ছাগলছানা আমাদের মালিকের ছেলে পুষেছে। সেটা দরজার মুখেই রাস্তার ধারে বাঁধা আছে বটে। কিন্তু—

প্রশ্নটা মনে ওঠবার আগেই তিনি তার কৈফিয়ৎ দিলেন, বললেন, বিশ্বাস করুন মশাই, আমি শিকার করি—বাঘ মেরেছি—ওই দেখুন তার চামড়া; তারই বিচিত্র শিকার-কাহিনী আপনাকে দিতে এসেছি। কিন্তু ছাগলছানা আর ব্যাঙ—এ দুটোকে আমার বড ভয়। দোহাই মশাই, ওটাকে আপনি সরান। ওরা লাফায় তিড়বিড ক’রে।

সত্যি বলব, হাসি খানিকটা পেয়েছিল। কিন্তু ভদ্রতার খাতিরে সম্বরণ করতেই হ’ল, এবং বাচ্চাটার সামনে দাঁড়িয়ে বললাম—আসুন।

—উঁহু। ওটাকে সরান মশাই। যে-রকম তিড়িং-তিড়িং ক’রে লাফাচ্ছে! অথচ বাঘের সঙ্গে লড়াই ক রে বাঘ মেরেছি, বাঘেব প্রেতাত্মার সঙ্গে যুদ্ধে এই কানটা দিয়েছি। কিন্তু ওই ছাগল অ্যাণ্ড ব্যাঙ! বাপ্‌স্!

অবাক হয়ে গেলাম। বাঘের প্রেতাত্মা?

কেন স্যর! গো-ভূত আছে, ঘোড়া-ভূত আছে, বাঘ-ভূত থাকবে না কেন? অবশ্য, ভূতের বদলে, দানা বলতে পারেন। বাঘ-দানা, বা বাঘ-দানো—অ্যাজ ইউ লাইক ইট।

গোটাচারেক পান মুখে পুরে আঁউ-আঁউ শব্দে চিবুতে লাগলেন এবং কথাও বলতে লাগলেন তারই মধ্যে। অনেক কষ্টে বুঝতে হ’ল।

—আপনি তো স্যর, আমাদের দেশের লোক। ছেলেবেলায় আফজল খেলোয়াড়ীকে অবশ্যই দেখেছেন। দানোটা ভর করেছিল আফজলের ওপর—বুঝছেন না ?

* * * *

আফজল খেলোয়াড়ী ? আফজল বাজীওয়ালা ?

মন আমার চ'লে গেল সেই ছেলেবেলায়। সেই চল্লিশ বছর আগে। মাঘ মাসে, চণ্ডীমায়ের মেলায় আসত আফজল খেলোয়াড়ী। লম্বা মানুষ, দেহের মাংস যেন হাড়ের সঙ্গে জড়ানো। লম্বা বাবরী চুল, ছাঁটা মেহেদী-রঙানো দাড়ি, চোখে সুরমা, পরনে লুঙ্গি আর ফতুয়া, মাঝারি একটা তাঁবু খাটিয়ে বসত মেলার দক্ষিণ দিকে। একটা জয়ঢাক বাজাত—'ছারকাছ। ছারকাছ! ছারকাছ!'

সে-বয়সে আফজলের সার্কাস বড় ভালই লাগত। আফজল আর তার ছেলে কসরৎ দেখাত। কত রকম কসরৎ! তারপর ছাগল আর ভেড়ার খেলা। তারপর টিয়াপাখীর খেলা। শেষের খেলা ছিল ঘোড়ার। অদ্ভুত খেলা—অদ্ভুত!

ঘোড়াটা—ছোটো-খাটো হাড়-জিরজিরে একটা ঘোড়া! কিন্তু, অদ্ভুত ঘোড়া!

আফজল নিজে মাথায় পাগড়ী বেঁধে, গোঁফে তা দিয়ে সাজত আগা সাহেব।

আফজলের ছেলে সাজত ঘোড়াওয়ালা। বলত—আগা! ঘোড়া লেগা?

—হাঁ, লেগা।

—একশো রূপেয়া দাম।

—পাঁচ রূপী, পাঁচ রূপী।

সঙ্গে-সঙ্গে ঘোড়াটা আগার ঘাড়ে সামনের পা দুটো তুলে দিত।

আগা চীৎকার করত—এ কেয়া?

ঘোড়াওয়ালা বলত—ঘোড়া বোল্‌তা কি, পাঁচ রূপী দাম দেগা তো ঘোড়া তুম্‌হারা-পর সওয়ার হোগা। তুম্‌কো চড়নে নেহি দেগা।

—হাঁ! এইসা বুদ্ধিমান ঘোড়া!

—হাঁ।

—তব দশ রূপী।

সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়াটা চিঁ-হি-চিঁ-হি শব্দে গোটা তাঁবুটা মুখরিত ক'রে তুলত।

আগা জিজ্ঞাসা করত—এ কেয়া?

—হাস্‌তা। দশ রূপী শুন্‌কে হাস্‌তা হায়।

তারপর ঘোড়াটার গায়ে চাপড় মেরে আদর ক'রে বলত—আরে বেটা, থেমে যা, থেমে যা। নইলে পেট ফেটে ম'রে যাবি।

আগা তখন বলত—এ তো তাজ্জব ঘোড়া!

—আলবৎ।

—কিন্তু দৌড়ায় কেমন?

সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়াটা একেবারে তাঁবুর মধ্যে ছুটতে শুরু করত।

—ইয়ে দেখো—কেমন দৌড়োয় দেখো।

ব'লেই ঘোড়াওয়ালাবেশী আফজলের বেটা লাফ দিয়ে ছুটন্ত ঘোড়ার উপর চ'ড়ে কসরৎ দেখাতে শুরু করত। এতক্ষণে আগা বলত—হাঁ, হাঁ। এ-ঘোড়া খুব এলেম্‌দার ঘোড়া বটে। ভাল, আমি চ'ড়ে দেখি একবার।

ঘোড়াওয়ালা নামত, আগা চড়ত। যেই চড়ত, অমনি ঘোড়াটা প'ড়ে যেত মাটিতে, জিভ বের ক'রে বারকয়েক পা ছুঁড়ে স্থির হ'ত। অমনি ঘোড়াওয়ালা বলত—এঁ্যা, তুমি আমার ঘোড়া মেরে দিলে? চল, তোমাকে পুলিসে দেবো। নইলে, দাও আমার ঘোড়ার দাম।

অনেক কথা-মাজা ক'রে, শেষে একশো টাকাই দিয়ে আগা কপাল চাপড়ে চ'লে যেত তাঁবুর বাইরে।

সে চ'লে যেতেই ঘোড়াওয়ালা মরা-ঘোড়াটার কানের কাছে মুখ নিয়ে ব'লে উঠত—ভপতি, পপতি—ভোঁ!

অমনি ঘোড়াটা ধড়মড় ক'রে দাঁড়াত। ঘোড়াওয়ালা হি-হি ক'রে হাসত—ঘোড়াটাও চিঁ-হি শব্দে চেঁচাত। অর্থাৎ, কেমন ঠকিয়েছি আগাকে!

ভারি ভাল লেগেছিল খেলা।

এর ক'বছর পর একবার আফজলকে দেখলাম—ফকীরের বেশে। ফকীরের পোষাক প'রে আফজল ভিক্ষে করছে।

তখন আমার বয়স কুড়ি-বাইশ বছর। কলেজে পড়ি।

বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—এ কি আফজল? ফকিরী নিয়েছ?

আফজল বললে—জী, হাঁ। কি করি, পেটের দায় হ'লে, হয় চুরি করতে হয়—নয় ভিক্ষে করতে হয়। তাই ফকিরী নিয়েছি।

—সে কি? তোমার সার্কাস চলছে না?

কপালে হাত দিয়ে আফজল বলেছিল—নসীব, বাবু। ঘোড়াটা ম'রে গেল, বড় ছেলেটা আমার সঙ্গে ঝগড়া ক'রে চ'লে গেল তার শ্বশুরবাড়ী। ছোট ছেলেটা বাঁদর আর ছাগল নিয়ে বেদেদের মত গাঁয়ে-গাঁয়ে খেলা দেখিয়ে দু'আনা চার আনা ভিখ মেঙে ফেরে। আমি বাবুসাব, সার্কাসওয়ালা আফজল—আমি কি তাই পারি? সব গেলে হয় বাবু—ইজ্জত গেলে ফেরে না। আমি ফকিরী নিয়েছি, খোদার নাম নিয়ে দাঁড়াই। যে দেয়—দেয়, না দেয়—না দেয়। ইজ্জত, বেইজ্জত—খোদাতয়লার।

আমি তাকে একটা টাকা দিয়েছিলাম।

বছর চারেক পর কালীপুজোর সময় হঠাৎ আফজল এসে হাজির হ'ল আমার বাড়ীতে। তখন আমি কাগজের আপিসে সহকারী-সম্পাদক। কালীপুজোর ছুটিতে কজন বন্ধুকে নিয়ে গিয়েছি দেশে, আমাদের দেশের কালীপুজো দেখাতে। আমাদের দেশে কালীপুজোর খুব ধুম। আট হাত, দশ হাত, বারো হাত লম্বা কালীপ্রতিমা হয়। মহেশপুরের কালী—পনেরো হাত। বাকুলের কালীপুজোয় দুশো আড়াইশো পাঁঠা বলি হয়। সেইসব শুনে বন্ধুরা দেখতে এসেছেন।

হঠাৎ আফজল সেলাম ক'রে দাঁড়াল—সালাম হুজুর।

আমি অবাক হলাম তাকে দেখে। তার পরনে পা-জামা, গায়ে পাঞ্জাবির উপর কাবুলী কুর্তা, মাথায় ফেজ টুপী, রীতিমত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আফজল। সবিস্ময়েই বললাম—আফজল, তুমি?

—হুজুর, হাঁ। হুজুরদের তাঁবেদার, গরীব আফজলই বটে। আফজল গরীব বটে, কিন্তু একদানা নিমক যে দেয় মেহেরবানি ক'রে, তাকে আফজল ভুলে যায় না। হুজুরকে সালাম জানাতে এসেছি—আর 'ছারকাছ' দেখবার জন্য নেওতা দিতে এসেছি।

—আবার সার্কাস করেছ? কি ব্যাপার?

—যার হুকুমে দুনিয়া চলে তার মর্জি, আর কি? হুজুর, খোদাতয়লার নাম করতে করতে মনের দুঃখে সরমে যাচ্ছিলাম দেশ ছেড়ে। হুজুর, বর্ধমান থেকে শেরশাহী পাকি-শড়ক ধ'রে হাঁটছিলাম। পথে পড়ে হুজুর দুর্গাপুরের জঙ্গল। জঙ্গলের ভিতর হুজুর, দু-পহরে ঢুকে হঠাৎ বুখার এল। মালোয়ারী বুখার তো আছেই, মাঝে মাঝে হেলে-কেঁপে আসে জ্বর, এসে গেল সেই জঙ্গলের মধ্যেই। চলতে আর পারলাম না। কি করব? গাছতলাতে শুয়ে পড়লাম। বুখার যখন কমল হুজুর, তখন সূর্য্যি পাটে বসছে। ভাবনা হ'ল তখন। সামনে রাত। এ-জঙ্গলে জানোয়ার আছে—বাঘ আছে, ভালু আছে, এখন কি করি? ভেবে চিন্তে উঠলাম একটা গাছে। গাছের ডালে উঠে তখন নজর এল—এ-জায়গায় বহুৎ কাক চিল শকুন উড়ছে। মনে ডর হ'ল বাবুজী, তবে কি বাঘ কোনো জানোয়ার মেরেছে—মড়ি প'ড়ে আছে? তা হ'লে তো নগিজেই আছে বাঘ। কি করি বাবুজী, আরও উঁচু ডালে উঠলাম। তখন কানে এল হুজুর, জানোয়ারের বাচ্চার কান্নার আওয়াজ। খানিকক্ষণ পরেই হুজুর, দেখি, একটা বিল্লী আসছে ওই আওয়াজ করতে করতে, আর তার মাথায় উড়ে উড়ে আসছে দু-চারটে কৌয়া। প্রথমে মালুম হ'ল—জংলী বিল্লী। তারপরই হুজুর, আফজল খেলোয়াড়ীর নজর বিলকুল চিনে ফেললে—আরে, এ তো চিতার বাচ্চা। হুজুর, খেলোয়াড়ী ছারকাছওয়ালার মেজাজ কি আর ঠিক থাকে। যা হয় হবে ব'লে, যত জলদি পারি নেমে পড়লাম গাছ থেকে। ছুটে গিয়ে গায়ের কম্বলটা ছুঁড়ে চাপা দিয়ে পাকড়ে ফেললাম। ভাবলাম না কি—পরে খোঁজে ওর মা আসবে। হুজুর, আমার ঝুলির মধ্যে ওকে পুরে নিয়ে, মুখটা বেঁধে, ফের উঠে

পড়লাম গাছে। গাছে চ'ড়ে হুজুর, খেয়াল হ'ল—ওর মা যদি আসে? সে তো গন্ধে-গন্ধে ঠিক আসবে। তা ছাড়া হুজুর, মা ডাক দিলেই, এটাও ঠিক সাড়া দেবে। তখন হুজুর, ফন্দী ক'রে, ছুরি দিয়ে নিজের একটা আঙুল চিরলাম, খুন বার হ'ল, তখন সেই আঙুলটা দিলাম বাচ্চার মুখে পুরে। নে, চোষ্। মধ্যে মধ্যে কষ্ট হয়, টেনে বের ক'রে নি। বাচ্চাটা জাগে, চেঁচায়—আবার আঙুলটা দিই। এমনি ক'রে কাটল সারা রাত। তাজ্জবের কথা—মা-টা এল না। সকালে হুজুব গাছ থেকে নামলাম। তখনও দেখি, সেই খানিকটা দূরে চিল-শকুন উড়ছে। হুজুর, সাহস ক'রে তখন গেলাম এগিয়ে। গিয়ে দেখি, একটা চিতাবাঘিনী ম'রে প'ড়ে আছে, তারই উপর লেগেছে চিল-শকুন, আর একটা বাচ্চাও দেখলাম; সেটাকে বোধ হয় জ্যান্তেই ছিঁড়ে খেয়েছে শকুনে। ঠাওর ক'রে দেখে বুঝলাম, বাঘিনীটার বসন্ত হয়েছিল। আমার ঝুলিতে এ বাচ্চাটা তখন ফ্যাঁস-ফ্যাঁস করছে। মনে মনে খোদাতয়লাকে বললাম—মেহেরবান, সমঝেছি তোমার মরজি। আফজল খেলোয়াড়ীর মনের দুঃখ ঘোচাতেই এ ব্যবস্থা তুমি করেছ। এটাকে ওই শকুন-চিলের ঠোঁট থেকে বাঁচিয়েছ। আর, সেইজন্তেই আফজলের এমন ক'রে বুখার এনে দিয়েছিলে। তাই হবে মেহেরবান। থাকল ফকিরী। তুলে রাখব ঘরে। যদি আবার মরজি হয়, তবে আবার পেড়ে ঝেড়ে-ঝুড়ে প'রে নিয়ে বেরিয়ে পড়ব; নয়তো ব'লে যাব, আমার কাফনের সঙ্গে দিয়ে দেবে। ব'লে হুজুর ফিরলাম ঘরে। তারপর হুজুব, বেটার মত বাঘটাকে খাইয়ে-দাইয়ে বড় ক'রে, খেলা শিখিয়ে, ফের 'ছারকাচ' খুলেছি দু'বছর হ'ল। ছোট বেটাটা ম'রে গেছে হুজুর, বড় বেটাকে নিই নি, তাকে দূর ক'রে দিয়েছি। তলব দিয়ে চাকর রেখেছি একটা—আর তার দুটো লেড়কী। রমজান আমার বহুৎ ভাল খেলা শিখেছে হুজুর। আপনি আমাকে নগদ একটা রূপেয়া দিয়েছিলেন, সে আমি ভুলি নি। মহেশপুরের মেলাতে তাঁবু পড়েছে আমার। হুজুরকে যেতে হবে। আর খবর পেলাম কি, হুজুর নাকি এখন খবরের কাগজের মনিজার হয়েছেন, হুজুরের কলমে নাকি যত তাজ্জব খবর বার হয়, দিন—রাত হয়,

রাত—দিন হয়; ফকীর—বাদশা হয়, বাদশা—ফকীর হয়ে যায় সে কলমের খোঁচায়। আমার খেলা দেখে এ গরীবের কথা আর আমার রমজানের কথা দুনিয়ায় জানিয়ে দিতে হবে।

আমি খুব উৎসাহিত হলাম। বললাম—নিশ্চয়ই যাব। আমার কজন দোস্ত এসেছেন, তাঁদেরও নিয়ে যাব। তাঁরাও সব বড় বড় কলমবাজ।

•　　　　•　　　　•

এক রাজার দুই রাণী। সুয়ো আর দুয়ো। দুই রাণীর দুই মেয়ে। রুমণী আর ঝুমনী। দুয়োরাণী ঘুঁটে বেচে খান। মেয়ে ঝুমনী, গোবর কুড়িয়ে আনে।··

আফজল তার ছারকাছের পোষাক প'রে এসে দাঁড়িয়ে বললে। এটা হ'ল খেলার ভূমিকা। এর পর চাকা-লাগানো খাঁচা টেনে নিয়ে এল আফজলের সেই মাইনে-করা লোক। খাঁচার ভিতর একটা তাজা চিতা বাঘ। কাঁচা বয়স, গায়ে যেন কে বার্নিশ মাখিয়ে দিয়েছে—চামড়ার হলদে রঙ আর কালো চাকাগুলি এমন চক্‌চক্‌ করছে। এসে দাঁড়াবামাত্র, বাঘটা দাঁতের পাটি বের ক'রে, নাকের চামড়া কুঁচকে উপরে তুলে গোঁফগুলোকে খাড়া ক'রে গর্‌গর্‌ ক'রে উঠল। তাকালে সকলের দিকে।

বাঘের দৃষ্টি বড় স্থির—দৃষ্টি দেখে ঠিক মতলব ঠাওর করা যায় না। শুধু চোখের তারা দুটি মধ্যে-মধ্যে ছোট হয়, আবার বড় হয় মিট্‌মিটে আলোর মত, আকাশের তারার মত।

আফজল বললে—আর বনের মধ্যে থাকে বাঘ আর বাঘিনী। জঙ্গলকে রাজকে রাজা আওর রাণী, বাদশা আওর বেগম। ·ইয়ে হ্যায় বাদশা; আর বেগম হ্যায় ঘরমে—রঙমহলমে।

—এ বনকে বাদশা, জনাব আলি, জাঁহাপনা। বড়া ভারী বীর, দুনিয়াকে রুস্তম। জাঁহাপনা—শাহানসাহ—রমজান শের আলি খান্‌-সাহেব!···

ব'লেই যায় এগিয়ে। খাঁচার দরজা দেয় খুলে। শের আলি রমজান—ছিপ্‌-ছিপে শক্তিশালী দেহ নিয়ে লাফ দিয়ে বেরিয়ে আসে।

—সালাম হুজুর আলি।

বাঘটা সঙ্গে সঙ্গে করে, আঁউ। ল্যাজটা নাড়তে থাকে।

ওদিকে খড়ের-তৈরী ন্যাকড়ায়-মোড়া একটা বাঘ এনে বসিয়ে দেয় সেই চাকরটা।

—ইয়ে হ্যায় বেগম। রৌশনআরা পিয়ারী বেগম।

বাঘটা একটা থাবা দিয়ে নেড়ে দেয় খড়ের বাঘিনী-বেগমকে।

আফজল বলে—বেগম গোস্সা করেছে, হুজুর। বলছে, হরিণ কি গৌ কি ভঁইষা—এ আর খাব না আমি।

—তবে কি খাবি রে বেগম?

কাপড়ের বাঘিনীর মাথাটা নেড়ে দিয়ে আফজল বলে—মানুষ, মানুষ খাব।

রমজান শের আলির গায়ে হাত দেয় আফজল। রমজান ল্যাজ নেড়ে বলে—আঁউ।

আফজল বলে—বলছে, বহুৎ আচ্ছা। চললাম আমি।

বাঘটার গলায় আছে একটা বগলস্, সেইটা ধ'রে আফজল তাকে টানে—রমজান সঙ্গে-সঙ্গে চলে। চ'লে যায় তাঁবুর ভিতরের কামরায়। তারপরই রমজান শের আলি ফিরে আসে—তার মুখে একটা ছোট দশ বছরের মেয়ে। মেয়েটার কোমরে-বাঁধা বেল্ট কামড়ে ধ'রে নিয়ে আসে। মেয়েটার হাতে ছোট একটা ঝুড়ি। এনে নামিয়ে দেয় পুতুল-বাঘিনীর সামনে।

আফজল বলে—দুয়োরাণীর মেয়ে ঝুম্‌নী এসেছিল গোবর কুড়োতে, রমজান শের আলি তাকেই মুখে ক'রে নিয়ে এসেছে।

মেয়েটা বলে—মামা গো! আমি তোমার ভাগ্নী। আমার নাম—ঝুম্‌নী। আমাকে তুমি খেয়ো না।

বাঘ বলে—গরর্—গরর্—ফঁ্যাস!

আফজল বলে—বলছে, আমি তোর মামা?

মেয়েটা বলে—হঁ্যা। তুমি আমার মামা।

বাঘ বলে—গরর্—গরর্—ফ্যাঁস!

—ভাল, তুই যদি আমার ভাগিনী, তবে বল্ তো, আমি দেখতে কেমন?

মেয়েটা বলে—আহা মামা, তুমি বড় সুন্দর, বড় সুন্দর।

বাঘটা এবার পুতুল-বাঘিনীর মাথায় থাবার নাড়া দিয়ে বলে—আঁউ!

আফজল ব্যাখ্যা ক'রে দেয়, বাঘ বলছে—বাঘিনী রে বাঘিনী, এই আমার ভাগিনী।

বাঘ আবার করে—আঁউ! অর্থাৎ, প্রশ্ন করে—আচ্ছা ভাগিনী, আমার চোখ কেমন?

—আহা মামা, পটল-চেরা। মেয়েটা তোতা-পাখীর মত ব'লে যায়।

বাঘ বলে—আঁউ। অর্থাৎ বাঘিনী রে বাঘিনী, এই তো আমার ভাগিনী। ঠিক—ঠিক। তাই তো আমি রাগি নি।

আবার করে—গরর্ গরর্। অর্থাৎ, গায়ের গন্ধ কেমন আমার? ব'লে দেয় আফজল।

মেয়েটা বলে—আঃ, মামা গো, গোলাপী আতরের মত।

—আঁউ—আঁউ—আঁউ। ল্যাজটা একেবারে দুলতে থাকে এদিক-ওদিক। অর্থাৎ, আনন্দে অধীর হয়ে বাঘ বলছে—বাঘিনী, বাঘিনী—এই আমার ভাগিনী—এই আমার ভাগিনী।

মেয়েটার চারদিকে ঘুরে ল্যাজ নাড়ে। তারপর আফজলের চোখের ইসারায় একটা ক্যাম্বিসের ব্যাগ আনে মুখে ক'রে। নামিয়ে দেয়।

আফজল বলে—এতে আছে সোনা-দানা মোহর-গহনা। দিলে সে তার ভাগ্নীকে। ব'লেই রঙীন একটা ওড়না, ঝুম্‌নীর গায়ে দিয়ে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে রমজান শের আলি বসে। ঝুম্‌নী তার পিঠে চাপে। রমজান শের আলি তাকে পিঠে নিয়ে চ'লে যায় তাঁবুর ভিতরে।

আফজল বলে—এই দেখে সুয়োরাণী আর তার মেয়ে রুম্‌ণীর বহুৎ হিংসে হ'ল। দুজনে পরামর্শ ক'রে রুমণী এলো বনের ধারে।

এবার আর-একটা মেয়ে এলো সার্কাসের খেলার জায়গায়—রুম্‌ণী।

আফজল বলে—বাস্, এইবার এলো রুম্‌ণী, সুয়ো-বেগমের বেটী।

মেয়েটা এসেই ডাকতে লাগল—মামা গো! মামা গো! মামা গো!

ভিতরে তাঁবু থেকে বেরিয়ে রমজান শের আলি স্থিরদৃষ্টিতে দেখতে লাগল রুম্‌ণীকে, আর ল্যাজ নাড়তে লাগল। এক-পা এক-পা ক'রে এগিয়ে এলো। বললে—আঁউ।

মেয়েটা বললে—আমি তোমার ভাগনী, মামা। রুম্‌ণী ভাগনী। ঝুম্‌নীর বহিন্।

বাঘ বললে—গরর্—গরর্—ফ্যাঁস। রুম্‌ণীর বহিন্ ঝুম্‌নী?

—হ্যাঁ, মামা। সে ঘুঁটে-কুড়ুনীর বেটী। আমি রাজরাণীর বেটী। তোমার মত রাজার আমিই হলাম আসল ভাগ্নী।

—ফ্যাঁস!—হাঁ?

—হ্যাঁ।

বাঘ ল্যাজ নাড়তে লাগল। তারপর বললে—আঁ—উ? আফজল ব্যাখ্যা করলে—তবে বল্ তো ভাগ্নী, আমি দেখতে কেমন?

মেয়েটা মুখ বেঁকিয়ে বললে—ম্যা গো! ছাই—ছাই—ছাই!

বাঘের ল্যাজ-নাড়া বন্ধ হ'ল। বললে—আঁ—উ!

আফজল বললে—বেগমকে বলছে শের আলি—বাঘিনী রে বাঘিনী, এ নয় আমার ভাগিনী।

আবার—আঁউ! অর্থাৎ, আমার নাক কেমন ভাগিনী?

—ম্যা গো। ঠিক যেন আমড়ার আঁটি!

—আঁউ—আঁউ! অর্থাৎ, বাঘিনী রে বাঘিনী, এ নয় আমার ভাগিনী। কক্ষনো নয় ভাগিনী।

এবার আফজল বললে—সের আলির ল্যাজ এবার আছাড় খাচ্ছে হুজুর। ঝুলছে না।

সত্যিই তাই। মাটির উপর মৃদু-মৃদু আছাড় খাচ্ছে ল্যাজ।

—আঁউ? আঁউ? আমার নাক কেমন?

—বোঁচা—বোঁচা—বোঁচা।

শের আলি উঠে দাঁড়াল এবার।—আঁউ—আঁউ! বাঘিনী রে বাঘিনী, এ নয় আমার ভাগিনী!

—আঁউ—আঁউ। গরর্—! আমার গায়ের গন্ধ কেমন?

—বোট্‌কা—বোট্‌কা! থু—থু—থু! থুতু ফেললে রুম্‌ণী।

ওই থুতু ফেলাটাই সিগনাল। এবার বাঘ রমজান শের আলি একটা হুঙ্কার ছাড়লে এবং দুই পা তুলে চাপিয়ে দিলে রুম্‌ণীর ঘাড়ে। রুম্‌ণী চীৎকার ক'রে শুয়ে পড়ল। বাঘটা মুখ হাঁ করলে। সঙ্গে-সঙ্গে পর্দা প'ড়ে গেল। আবার পর্দা খুলে গেল। এবার শের আলি একা দাঁড়িয়ে ল্যাজ নাড়ছে। মুখের চারিপাশে লাল রক্ত মাখানো।

আফজল বললে—খা লিয়া রুম্‌ণীকে।

এর পর আফজল নিজে মাথায় পাগড়ী নিয়ে হাতে একটা নল নিয়ে সামনে দাঁড়াল। বললে—এইবার রাজা এল। বন্দুক নিয়ে, বাঘকে মারবে।

বাগিয়ে ধরলে নলটা। বললে—আমার রুম্‌ণীকে তুম্ খা লিয়া?

বাঘ বললে—আঁউ!

আফজল বললে—কি বলছিস্? রুম্‌ণী তোর নিন্দে করলে কেন?

—আঁউ!

—কি? ঝুম্‌নীকে তো অনেক ভাল জিনিস দিয়েছিস? তবু তোকে ছাড়ব না?

ভেতরে একটা পটকার আওয়াজ হ'ল দুম্ ক'রে। সঙ্গে-সঙ্গে শের আলি রমজান শুয়ে পড়ল মাটিতে।

পর্দা প'ড়ে গেল। আবার উঠল। রমজান শের আলি আর সেখানে নাই। ঝুম্‌নী ব'সে-ব'সে সেখানে কাঁদছে—মামা গো! ওগো, মামা গো!

খেলা শেষ এখানেই।

বন্ধুরা হেসে বললেন—শেষটাতেই মরেছে। ওটা করতে গেল কেন?

এর উত্তর দিলে আফজল। খেলার শেষে সে রমজানকে শেকলে বেঁধে নিজে হাতে ধ'রে নিয়ে আমাদের সঙ্গে দেখা করলে। আমরা ভয় পেলাম একটু। আফজল বললে—কুছ্ ডর্ নাই হুজুর। আমার শের আলির কলিজায় হিংসে নাই। আমি ওকে রোজ কানে তিনবার নামাজের সময় লা ইলাহি শোনাই। আর বলি—রমজান বেটা, খোদতয়লা তোকে আমার হাতে দিয়েছেন। খোদার নাম শুনে নে, মনে-মনে আওড়ে যা। হিংসে ভুলে যা। হুজুব, ওই আমার বেটা। আমার খানা-পিনা, কাপড়-জামা যা-কিছু খরচ ওই জোগায়। বুদ্ধি দেখলেন না? কেমন খেলা দেখালে? বন্দুকের আওয়াজ হবামাত্র শুয়ে গেল। মরল। একবার ল্যাজ নাড়লে না। পা নাড়লে না। কান নাড়লে না।

—সেটা তো লক্ষ্য করি নি!

তাই নাকি?—একজন বন্ধু বললেন।

আফজল বললে—হাঁ হুজুর। আওয়াজ হবামাত্র প'ড়ে যাবে, আর বিলকুল মুর্দার মত প'ড়ে থাকবে। একটা চুল হিলবে না। নইলে কি হুজুর, শের আলি ম'রে যায় ব'লে দেখনেওয়ালারা এমন ক'রে কাঁদে! আপনারা দেখেন নি হুজুর। লোকে কাঁদে।

একজন বন্ধু বললেন—ও! করুণ-রস সৃষ্টি করেছে আফজল।

আফজল ঠিক বুঝতে পারল না। প্রশ্ন করলে—কি বলছেন হুজুব?

আমি বললাম—বাঘের শোকে লোককে তুমি কাঁদিয়েছ, ভাল খেলা—তাই বলছেন।

—জী, হুজুব! তা আপনার কলমে আখবরে আমার রমজান শের আলির কথা যদি ছাপা হয়ে যায়, তবে তো আমার দিল খুসী হয়। লিখবেন—খোদাতয়লার মর্জি হ'লে, বাঘ যে বাঘ—সেও হয় মানুষের বেটা। মানুষের মতই তার দরদ হয় তখন। হিংসে সে করে না। ভালবাসে, বেটার মত।

* * *

হ্যাঁ মশাই। ছাট—ছাট আফজল। ছাট ছোটলোকটা। অ্যাণ্ড স্তর, টাইগারটা সেই টাইগার রমজান শের আলি। মশাই, ছাট উল্লুকটা ইদানীং টাইগারটাকে চেনে বেঁধে নিয়ে ঘুরে বেড়াত। মশাই, টাইগার কি ডগের মত পোষা হয়? না, পোষ মানলেই টাইগার ডগ হয়ে যায়?

বললেন শিকারী জমিদার-নন্দন।

বুঝেচেন না স্তর! ইদানীং আফজলেব 'ছারকাছ' আর চলছিল না। লোকে আর কাঁদত না স্তর, লাফ্ করত—মানে, হাসত। কতদিন আর সেই একঘেয়ে খেলা দেখবে? বাঘিনী রে বাঘিনী—এই আমার ভাগিনী, আর এ নয় আমার ভাগিনী। রাবিশ, মশাই রাবিশ। বুঝেচেন, এককালে ছেলে-বয়সে আমারও বেশ ভাল লেগেছিল। তারপর স্তর, নানা জায়গার সারকাস দেখলাম—গ্রেট ইণ্ডিয়ান সারকাস, হটেন্‌টটেন সারকাস, লাফিন্টোন সাবকাস, মশাই, একেবারে রয়েল বেঙ্গল টাইগার, এ্যাফ্রিকান্ লায়ন, এলিফ্যাণ্ট কত দেখলাম স্তর! সে-সব দেখার পর আর ভাল লাগে ওই রাবিশ! লোকেরও টেস্ট কত ভাল হয়েছে, তাদেরও ভাল লাগে না। নতুন দেশী সরকার হয়েছে—তারা নানারকম খেলা দেখায়। নতুন খেলা, গ্রেট—গ্রেট খেলা। সে-সব দেখে, মাথার হেয়ার স্ট্রেট হয়ে দাঁড়িয়ে ওঠে। কাজেই উঠে গেল আফজলের ছারকাছ! ছারকাছই বটে! আফজল বলত—'ছারকাছ'।

হে-হে ক'রে হাসতে লাগলেন জমিদার-কুমার। গোটাকয়েক পান মুখে পুরে ডিবেটা আমাব দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন—বিটল খাবেন নাকি? জাফরাণ-দেওয়া বিটল। গরম হয়ে যাবে শরীর।

সবিনয়ে বললাম—না।

বেশ খানিকক্ষণ চিবিয়ে পান-কটাকে বাগিয়ে নিয়ে, জমিদার-কুমার বললেন—হঠাৎ স্তর, খবর পেলাম—পাশের গাঁয়ে বাঘ এসেছে। বাঘ? আমাদের অঞ্চলে বাঘ? আমি স্তর, বাঘ মারব ব'লে ফাইভ ইয়ার আগে রাইফেলের লাইসেন্স নিয়েছি। হাজারীবাঘ যাব, নয় যাব টেরাই, নয় আসাম—ঠিক করেছি। মনে মনেই করেছি। কাউকে বলি নি।

কেন জানেন? আমার পিসীমা বড ভীতু! লাস্ট ফাইভ ইয়াব তিনি কিছুতেই যেতে দেন নি। এবার তাই কাউকে বলি নি। ঠিক কবেছিলাম, একদিন রাত্রে গৌতম-বুদ্ধেব মত বেরিয়ে পডব, ওন্‌লি ওয়ান বেডিং, ওয়ান সুটকেস, ওয়ান টিফিন-কেরিয়ার, অ্যাণ্ড এটা-সেটার একটা ওয়ার-মার্কা ঝোলা অ্যাণ্ড টু গান্‌স্—ওয়ান রাইফেল, ওয়ান টুয়েল্ভ বোর, ফিফ্‌টি কার্টিজ, অ্যাণ্ড কোমরে ওয়ান রিভলবার, ওয়ান ড্যাগার। বাস্—আর নাথিং। হ্যাঁ, আর-একটা ফোল্ডিং তাঁবু। অ্যাণ্ড ওয়ান নিউ কার। রয়েল বেঙ্গল মেরে, স্ট্রেট চ'লে যাব আফ্রিকা, সেখানে লায়ন্ অ্যাণ্ড স্যর গরিলা। বাস্—তবে আমার নির্বাণ। একেবারে শিকারে চ্যাম্পিয়নই বলুন, আর বুদ্ধই বলুন হয়ে, কাম ব্যাক করব হোম—সুইট্ হোম। এরই মধ্যে মশাই, একেবারে হোমেই খবর এল, পাশের গাঁয়ে টাইগাব।

হরিচরণ চাটুজ্জের বাড়ীতে ঠিক দুপুরবেলা বাঘ ঢুকেছে। চাটুজ্জেব বাড়ীটা গাঁয়েব শেষে। আম-বাগানেব ধারে। চাটুজ্জের স্ত্রী নালার ধারে ভাতেব মাড গডাচ্ছিলেন। অ্যাণ্ড স্যব, আপনি নিশ্চয় জানেন, আমাদেব দেশে নালার মুখে মাটিব পাত্র বসানো থাকে, মাড সেখানে জমা হয়, রাখালে তুলে নিয়ে যায়, গরুকে খাওয়ায়। ও মশাই, চাটুজ্জে-গিন্নী মাড গডাচ্ছেন—এমন সময় কেমন বোকটা গন্ধ! কিসেব গন্ধ? থু-থু-থু—থুতু ফেলেছেন তিনি। বাস্, অমনি 'আঁউ' শব্দ!

চাটুজ্জে-গিন্নী ভেবেছেন, রোঁয়া-ওঠা কুকুরটা। তিনি আবার থু-থু ক'রে থুতু ফেলে বলেছেন—ছেক্! ছেক্! দূর! দূর! মুখপোড়া কুকুর! মশাই! এবার হালুম ক'রে লাফ দিয়ে এপারে পড়লেন তিনি। হলুদ রঙ, তাতে কালো ছাপ। হাঁড়ির মত মুখ। লাফিয়ে প'ড়েই ল্যাজ আছড়াতে-আছড়াতে 'আঁউ' শব্দ ক'রে উঠল। চাটুজ্জে-গিন্নী হাঁড়ি ফেলে দুটো ছেলে ভাত খাচ্ছিল তাদের নড়া ধ'রে টেনে ঘরের মধ্যে ঢুকে খিল দিয়ে চেঁচাতে লাগলেন—বাঘ! বাঘ! বাঘ!

চাটুজ্জে ছিল পুকুর-ঘাটে। সে ঘরে এল ছুটে, ভাবল—শেয়াল। এসেই দেখে, ওরে ব্রাদার! এ যে সত্যিই। তিনি আবার ছুটে গিয়ে

ডোবার জলে ঝপাং। এদিকে বেটা বাঘ—ছেলেগুলোর পাতের ভাত, হাঁড়ি ভেঙে হাঁড়ির ভাত, এমন কি স্যর ওই গরুর মাড পর্যন্ত চেটে শেষ ক'রে স'রে পড়ল।

লোকে হৈ-হৈ ক'রে ছুটে এল আমার কাছে।

আমি বললাম—কি করব গিয়ে? বাঘ কোথায়? এখন খুঁজে পাব কোথায়? আগে কাউকে মারুক। তখন সেই মড়ি বার ক'রে—পাশে মাচা বেঁধে—রাত্রে ব'সে থাকব।

লোকেরা গেল। উল্লুকের দল—শিকারের এ-বি-সি জানে না, আমাকে কাওয়ার্ড ব'লে গেল। কি বলব? আমি স্মাইল করলাম।

ভোরবেলা মশাই, আবার হাঁকাহাকি। আমার আবার ভোরবেলাতেই স্লিপটা ভাল হয়—যাকে বলে, নোজ কল্ ক'রে ঘুম, সেই ঘুম ভেঙে গেল। জিজ্ঞাসা করলাম—কি ম্যাটার? না, বাঘ। শিগ্গির গান্ নিযে ছুটে আসুন।

বাঘ? হোযার? কাকে কিল করেছে?

না,—কিল কাউকে করে নি, তবে নারাণ বীরবংশীর হেঁসেল ঘরে ঢুকে হেঁসেল তছনছ ক'রে দিয়ে দিব্যি আরামে সে শুযে আছে। শিগ্গির আসুন। কি করি মশাই? আমার আবার সকালে উঠেই চা না হ'লে চলে না। তাও স্পেশাল চা। র-টি—উইথ লিমনজুস। না হ'লে হোল-ডে মাটি। তার উপর পরনে লুঙ্গি অ্যাণ্ড গায়ে একটা গেঞ্জি। বুঝলাম—টাইগার-ফাইগার নয়; বড-গোছের শেয়াল, নয় তো হেঁড়োল, মানে—হর্যক্ষ, হায়েনা। বন্দুকটা নিয়ে চটি প'রেই গেলাম স্যর। গিয়ে দেখি—টেরিবল কাণ্ড। লোকজন হৈ-হৈ করছে, ছুটে পালাচ্ছে। কি ম্যাটার? হ'ল কি রে বাপু? না,—টাইগার, ছেলে নিযে পালিযেছে। ছেলে? কার ছেলে? আমি মশাই, দাঁড়িয়ে গেলাম। এইবার হয়েছে। এইবার মড়ি হয়েছে। বললাম, খোঁজ ক'রে দেখ, কোথায় দেহটা পাওয়া যায়। খানিকটা খেয়ে, বাঘটা এখন জঙ্গলে লুকোবে। সেখানে রাত্রে মাচায় ব'সে মারব ওটাকে। এখন ডোণ্ট গো। শিকার করেছে, এখন বাধা পেলে দু-চারটের মাথা থাবা মেরেই ব্রেক ক'রে দেবে।

বাড়ী ফিরে এলাম। চা-টা খেলাম। আবার মশাই লোক এল।

কি? না, ছেলেটাকে পাওয়া গেছে। আশ্চর্য! কোনো ক্ষতি করে নি। রক্ত পর্যন্ত পড়ে নি। জামায় কামড়ে তুলে নিয়ে গিয়েছিল। পথে ফেলে দিয়ে চ'লে গেছে। শুধু মুখের কাছে বারদুয়েক আঁউ-আঁউ করেছিল, ছেলেটা অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল ভয়ে। এখন বাঘটা একটা বট-ট্রির ওপর উঠে ব'সে আছে।

বুঝুন, ম্যাটারটা বুঝুন। টাইগার মারতে লোকে মাচা বাঁধে, মাচায় চড়ে, গাছে চড়ে, এ টাইগার—গাছে চড়ে। আমাকে থাকতে হবে নীচে। জাম্প যদি করে, তবে একেবারে সঙ্গে-সঙ্গে দি এণ্ড। আবার সুবিধেও আছে। ওপরে গাছে বাঘ, পাখী শিকারের মত—এম পাওযা যাবে। তবে, গ্রেট রিস্ক। তবু মশাই লোকের কাছে কাওয়ার্ড হতে পারি না। গেলাম। মশাই, দু-তিনখানা গাঁয়ের লোক ভেঙেছে, কিন্তু প্রায় ওয়ান মাইল দূরে দাঁড়িয়ে বলছে—ওই বাঘ। সঙ্গে কেউ যাবে না মশাই। শেষে জন-দুই রাজী হ'ল। গিয়ে দেখি, বট নয়, একটা অশথ-গাছের ডালের খাঁজে চেয়ারে-বসা মানুষের মত ব'সে আছে।

মশাই, রাইফেল তো তুললাম। সত্যি বলছি, রাইফেল খুব অভ্যেস নেই। এম আর হয় না। ভারীও খুব। শুধুই ন'ড়ে যায়। এম যদি হ'ল, এমন সময় পেছন থেকে দেখি, একজন ফকীর প্রায় টলতে টলতে ছুটে আসছে।

—মেরা রমজান—মেরা রমজান!

বেটা আফজল। বেটার জ্বর হয়ে কদিন প'ড়ে ছিল জঙ্গলের মধ্যে। এর মধ্যে বাঘটা শেকল খুলে ছুটেছে। বেটা গোলমাল শুনে জ্বর-গায়েই ছুটে এসেছে—মেরা রমজান—

—তোর মাথা। রমজান আর রমজান নাই। দুদিন ছাড়া পেয়েই সে যে ওয়াইল্ড সেই ওয়াইল্ড হয়ে গিয়েছে।

দিলাম দেগে বন্দুক।

বাস্। বাঘটা লাফ দিয়ে প'ড়েই ধপ্ ক'রে প'ড়ে গেল। একেবারে নিশ্চুপ।

—ওযা ফতে ! ব'লেই গেলাম ছুটে।

পেছনে পেছনে আফজল—না—না—না।

ও মশাই! গিয়ে দেখি, বাঘ একেবারে আনহার্ট। কোথাও গুলি লাগে নি, অ্যাণ্ড স্যর আমার চার হাত দূরে উঠে দাঁড়িয়ে ল্যাজ নাড়ছে। করব কি? স্ট্রেট শুয়ে গেলাম, বন্দুকটা ওপরে উঁচিযে ধবলাম; আমাব ওপরে জাম্প করতে হ'লে, বন্দুকের মুখে পড়তেই হবে। মশাই, আমার গুড লাক্—বন্দুকটা কি ক'বে ওয়েন্ট অফ—গুলি ছুটে গেল, অ্যাণ্ড স্ট্রেট বাঘের বুকে। মশাই, এবার যে হুঙ্কার সে করলে—কি বলব? টেরিবল। আমার মশাই, আর জ্ঞান ছিল না। বলুন না, এতে কি জ্ঞান থাকে?

জ্ঞান যখন হ'ল, তখন দেখি খানিকটা দূবে বাঘটা ম'রে প'ড়ে আছে—তার পাশে রক্তাক্ত ক্ষত-বিক্ষত দেহ আফজল প'ড়ে গোঙাচ্ছে। শুনলাম গুলি খেযেই বাঘটা লাফিযে খানিকটা দূবে প'ড়েই আবাব উঠে দাঁড়ায়—সে তখন তার কি ভয়ঙ্কর মূর্তি! আমাকেই চার্জ করত। কিন্তু আফজল পড়ল সামনে। সে ছুটে যাচ্ছিল—মেরে রমজান, মেবে শের আলি—! বেটা দুই হাত মেলে ছুটে যাচ্ছিল—যেন ওটা তাব সত্যিই বেটা। কিন্তু স্যর, সে টাইগার।

আফজল পাগলের মত তাব গলা জড়িযে ধরতেই—সে তাকে চার্জ করেছে। তারপর পড়ল লুটিযে। আফজলেব ডান কাঁধটা চিবিয়ে দিয়েছে।

আফজল তখনও গোঙাচ্ছে—বেটা!—বেটা!

এই নিন্ স্যার, সেই শিকার-কাহিনী। এ গ্রেট এ্যাডভেঞ্চার।

কিন্তু, আপনার কানটা? ওটা?

ওটা আফজল ছিঁড়ে নিয়েছে। কিন্তু ঠিক আফজল নয়, বাঘের প্রেতাত্মা।

আফজল আমার বাড়ীতেই মরেছে। সেপ্‌টিক হয়ে ফুলেছিল। বলব কি মশাই, লোকটার মুখখানা দেখে মনে হচ্ছিল, ঠিক বাঘের মুখ। আমি শপথ ক'রে বলছি—ঠিক বাঘের মুখ। আর সেই 'আঁউ-আঁউ' ডাক।

সেই সময় মরবার আগে, আমি পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছি—অমনি বুঝলেন না—আমার দিকে তাকিয়ে দেখে একেবারে কাঁধের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ভাগ্যে খুব মোটা ওভারকোট পরা ছিল, তাই কাঁধটা বাঁচল, কিন্তু কানটা বাঁচল না। হাতের নখ দিয়ে—আফজলের হাতে বড় বড় নখ ছিল—বসিয়ে আধখানা ছাড়িয়ে নিলে।

ডাক্তারেরা গোটাটাই কেটে দিলে। বললে—ওর নখে দাঁতে এখন বাঘের নখ-দাঁতের বিষ হতে পারে। সঙ্গে-সঙ্গে নানা রকম ইন্‌জেকশন।

সরকার থেকে এই রাইফেলটা প্রাইজ দিয়েছে, স্যর। এটা ছেপে দেবেন। এই ফোটোটা সমেত।

সেটা ছাপি নি। আমি আফজলের আর রমজানের কথা লিখলাম। শিকারী জমিদারবাবু যেন আমাকে ক্ষমা করেন। কারণ, আফজল বলেছিল—হুজুর, রমজান শের আলি বাঘ হ'লে কি হয়—আসলে ওই আমার বেটা। যে বেটা আমার ম'রে গেছে খোদাতয়লা তাকে বাঘ ক'রে আমাকে ফিরিয়ে দিয়েছে। কেন জানেন? ছেলেটা তো রোজগার ক'রে খাওয়াতে পারলে না, খেল্ দেখিয়ে নাম করতে পারলে না। তাই রমজান শের আলি আমার বেটা।
